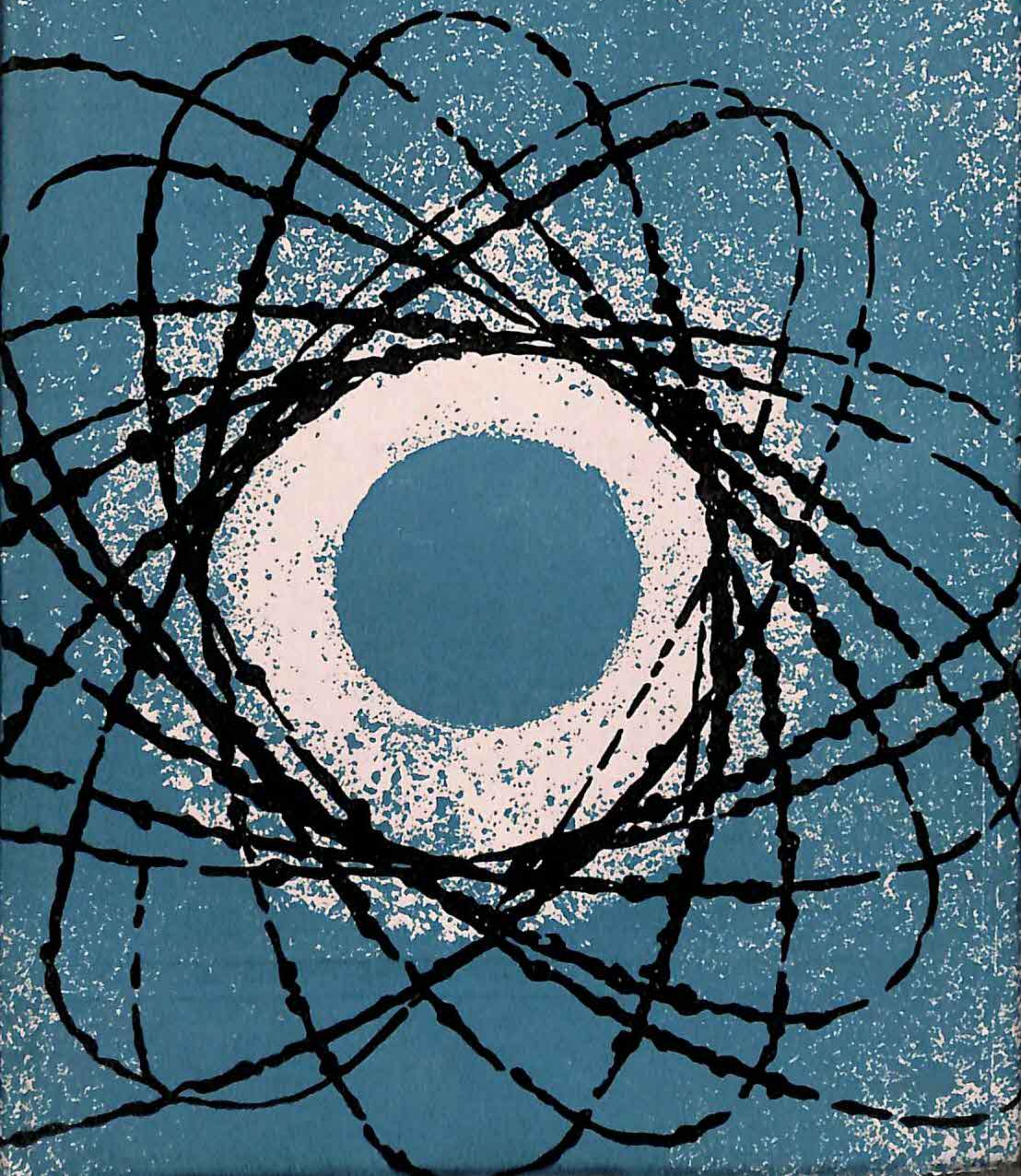
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি





বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গোপালচন্দ্র

মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৯০
আশ্বিন ১৩৯৭

প্রকাশক
শ্রীসুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

মুদ্রক
বি. এন. শীল
ইম্প্রেসন কন্সালট্যাণ্ট
৩২/ই জয়মিত্র স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৫

দাম ২০ টাকা
Rs. Twenty only

সংকলকের উৎসর্গ

গোপালচন্দ্রের স্ত্রী

লাবণ্যময়ী (টুনি) ভট্টাচার্য

স্মরণে

প্রকাশকের নিবেদন

গোপালচন্দ্রের পরিচয় দেওয়া বাংলা ভাষায় যাঁরা জনপ্রিয়-বিজ্ঞান-পাঠক তাঁদের কাছে অনাবশ্যক।

বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদক ও বিজ্ঞান-সাংবাদিক হিসাবে গোপালচন্দ্রের বিস্মৃত এবং এ-যাবৎ অনালোচিত রচনা নিয়ে এই সংকলন। প্রসঙ্গত বলা দরকার—বিজ্ঞান-সংবাদগুলি অস্বাক্ষরিত এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত। গ্রন্থে বৎসর ও মাসের উল্লেখ আছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পরিচালকদের কৃতজ্ঞতা জানাই। সংকলনে সাহায্য করেছেন সুবীর ভট্টাচার্য।

বিনীত

প্রকাশক

এই লেখকের আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

বাংলার কীটপতঙ্গ

করে দেখ ১,২,৩ এবং অখণ্ড সংস্করণ

বিজ্ঞান অমনিবাস

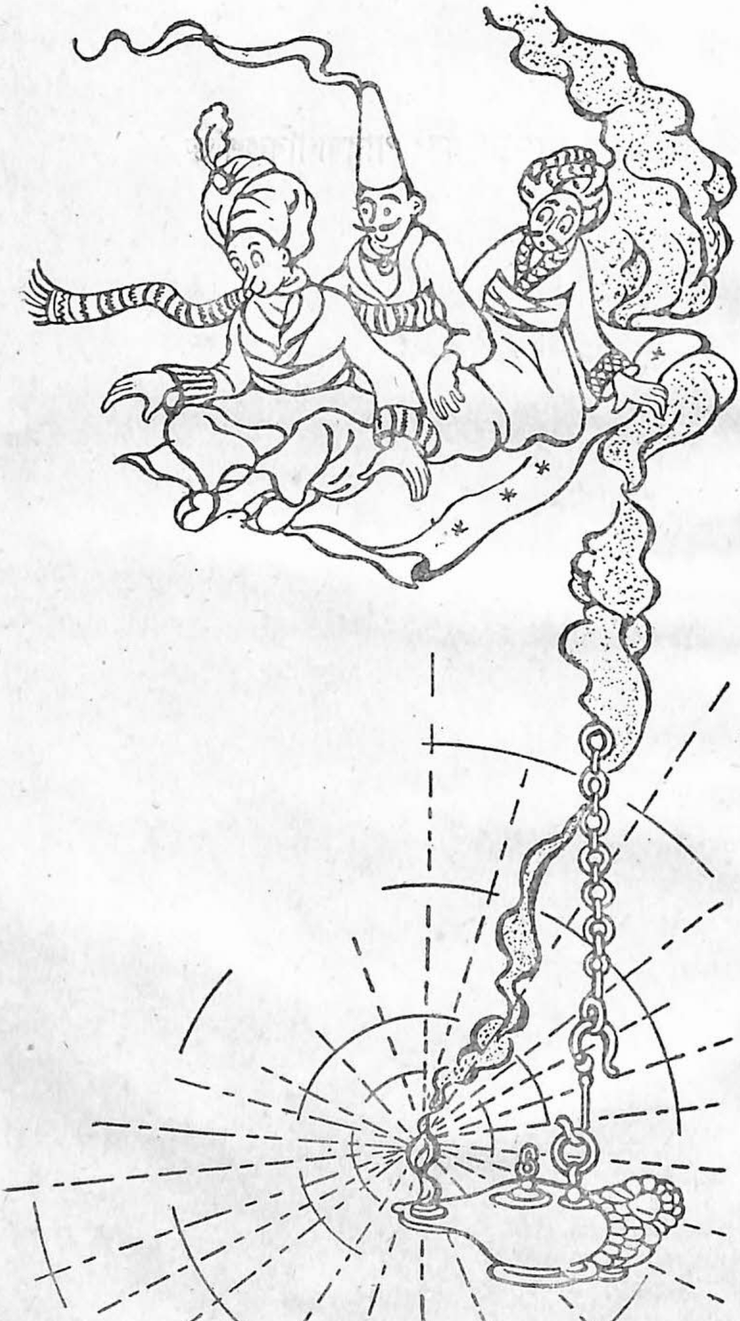
বাংলার মাকড়সা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা খবর

বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংবাদ

সূচী

আমরা এবং পারমাণবিকশক্তি



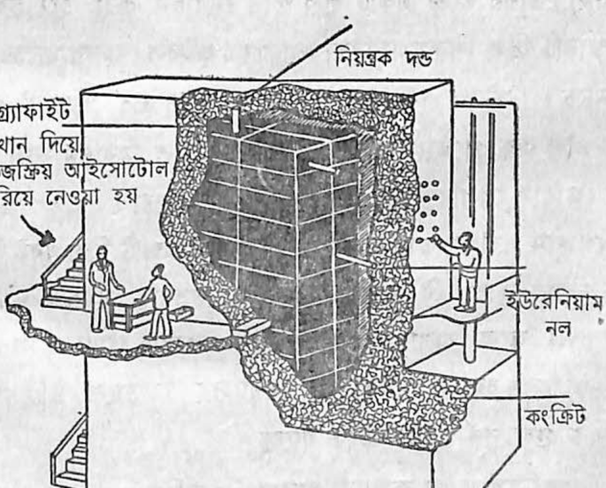
বহু শতাব্দী পূর্বে।

একটা প্রদীপের গল্প প্রচলিত ছিল—প্রদীপটা নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করতে পারতো। সেটাকে বলা হতো "আলাদীনের প্রদীপ"। সত্যিকার এইরকমের কোনো প্রদীপ ছিল না বটে, কিন্তু তার বিস্ময়কর কার্যকলাপের জন্যে গল্পটা আজও প্রচলিত রয়েছে।

এটা হলো পারমাণবিক চুল্লীর গল্প—প্রায় আলাদীনের প্রদীপের মতই একরকমের চুল্লী, যা অতি অদ্ভুত কাজ করতে পারে। এটা হলো সত্যিকারের জিনিস।

কতকগুলি চুল্লী আছে, যাতে কয়লা জ্বালানো হয়, কতকগুলিতে জ্বালানো হয় গ্যাস, আবার কতকগুলিতে জ্বালানো হয় তেল। এদের সবগুলি থেকেই উত্তাপ পাওয়া যায়।

তেল আর গ্যাসের চুল্লী জ্বলবার সময় ভীষণ শব্দে গ্যাস নির্গত হতে থাকে। কয়লার চুল্লী থেকে গ্যাস আর ধোঁয়া নির্গত হয়। জ্বালানী পুড়ে গেলে ধুলোর মতো যে ভস্ম পড়ে থাকে, সেগুলি সরিয়ে নিতে হয়।



পারমাণবিক চুল্লী থেকেও উত্তাপ নির্গত হয়—অতি প্রচণ্ড উত্তাপ।

যদি এরূপ উত্তাপ সহনক্ষম কোনো পদার্থ থাকতো, তাহলে সেই পদার্থে তৈরি চুল্লী থেকে সূর্য-পৃষ্ঠের উত্তাপের চেয়েও বেশি উত্তাপ পাওয়া যেত।

জ্বলবার সময় এই চুল্লীতে কোনো শব্দ হয় না। এই চুল্লী চাঁদের মতো শান্ত। জ্বলবার সময় এতে কোনো অগ্নিশিখা থাকে না। মনে হয়, সেটা যেন সুবৃহৎ একটা ঠাণ্ডা কাচখণ্ডের মতো নিশ্চল। এতে কোনো ধোঁয়া নেই। এই চুল্লীর কোনো চিম্‌নিও নেই। বাতাস ছাড়াই এটা জ্বলে। চুল্লীতে প্রবেশ করবার সময় জ্বালানী যেমন দেখায়, চুল্লী থেকে বেরিয়ে আসবার পরেও তাকে ঠিক সেই রকমই দেখায়।

প্রথম পারমাণবিক চুল্লী তৈরি হয়েছিল ১৯৪২ সালে। এর গঠন-প্রণালীর বিষয়টি ছিল খুবই গোপনীয়। আমেরিকা ছিল তখন যুদ্ধে লিপ্ত এবং বৈজ্ঞানিকেরা চুল্লী নির্মাণ করবার সময় যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন, পরে প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরিতে তা সহায়ক হয়েছিল।

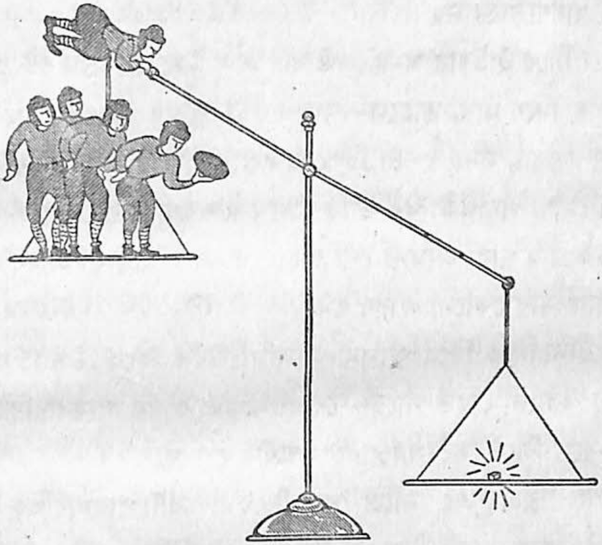
চুল্লী তৈরির জন্যে একটি গুপ্ত স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল। এই গুপ্ত স্থানটি ছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল খেলার মাঠের 'ব্লিচার'-এর নীচে। স্ট্যাগ ফিল্ডের ওয়েস্ট স্ট্যাণ্ডস্-এর 'ব্লিচার'-এর তলায় কতকগুলি রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ আছে। যে কক্ষটিকে নির্বাচন করা হয়েছিল, সেটি স্কোয়াস খেলার কোর্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

গোপন পরীক্ষা-কার্য চালাবার পক্ষে এই কক্ষটি ছিল খুবই উপযোগী। মোটর-আরোহীরা ঐ রাস্তা অতিক্রম করবার সময় এবং বালক-বালিকারা স্কুলে যাবার সময় ধারণাও করতে পারতো না যে, স্ট্যাগ ফিল্ডের আঙুরলতা আচ্ছাদিত দেয়ালের আড়ালে ইতিহাসের এক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকেরা যে জ্বালানী ব্যবহার করেছিলেন, তা হলো ইউরেনিয়াম (উচ্চারণ—ইউ-রেন-ইয়াম)।

এই পদার্থটি হলো, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারি পদার্থগুলির অন্যতম।

১০ ঘন ইঞ্চি পরিমিত একটি ইউরেনিয়াম খণ্ডের ওজন প্রায় ১০০০ পাউণ্ড।



ইউরেনিয়াম মাটির তলায় খনি থেকে উত্তোলিত হয় [পিচব্লেণ্ড নামক খনিজ পদার্থ থেকে]। লোহা বা রুপোর মতো এটাও একটা ধাতব পদার্থ। এর রঙও রুপোর মতো। তাছাড়া, অধিকাংশ ধাতব পদার্থের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় মাটির নীচে এই পদার্থটিও অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। খনি থেকে আকরিক উত্তোলনের পর ইউরেনিয়াম পৃথক করে নিতে হয়।

পূর্বেকার স্বর্ণ-সন্ধানীদের তুলনায় আধুনিক ইউরেনিয়াম-সন্ধানীদের একটা সুবিধা আছে। ইউরেনিয়াম থেকে একরকম মৃদু বিকিরণ নির্গত হয়, যাকে [হান্স গাইগার আবিষ্কৃত] 'গাইগার কাউন্টার' নামে এক-প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যেতে পারে। ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত অদৃশ্য রশ্মি টেলিগ্রাফের সাঙ্কেতিক শব্দের মতো 'গাইগার কাউন্টারে' খট খট শব্দ উৎপন্ন করে।

যেহেতু প্রথম পারমাণবিক চুল্লীতে এবং যুদ্ধের সময় নিক্ষিপ্ত প্রথম

পারমাণবিক বোমায় ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয়েছিল, সেহেতু অনেকেরই ধারণা, এই পদার্থটি সব রকম অবস্থাতেই ভয়ানক বিপজ্জনক।

এই ধারণা সত্য নয়।

রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় কেউ যদি এক টুকরো বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ধাতুর কাছ দিয়ে যায়, তাহলে—বড় একটা পাথর খণ্ডের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবার সময় যতটা বিপদের সম্ভাবনা, তার চেয়ে বেশি কোনো সম্ভাবনা নেই। পদার্থটা খুব ভারি বলে সে অবশ্য তার (ইউরেনিয়ামের) একটা টুকরোর দ্বারা আঘাত পেতে চাইবে না—তাছাড়া এ থেকে তার ভয় পাবার আর কোনো কারণ নেই।

ইউরেনিয়ামকে দিয়ে আপনা-আপনি কেমন করে উত্তাপ ও শক্তি উৎপাদন করানো যেতে পারে—বৈজ্ঞানিকেরা প্রথম পারমাণবিক চুল্লী তৈরি করতে গিয়ে সেই সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ফুটবল ব্লিচার-এর নীচে বৈজ্ঞানিকেরা যে (পারমাণবিক) চুল্লী তৈরি করেছিলেন, সেটা দেখতে সাধারণ চুল্লীর মতো নয়।

প্রথমে তাঁরা এক স্তর কালো ইট বিছিয়ে দিলেন। অধিকাংশ পেন্‌সিলে গ্র্যাফাইট নামক যে পদার্থ ব্যবহৃত হয়, এই ইটগুলিও ঠিক সেই একই গ্র্যাফাইট দিয়ে তৈরি।

এই স্তরের উপরে তাঁরা কোণে ইউরেনিয়াম বসানো আর এক স্তর গ্র্যাফাইট ইট স্থাপন করেন। তার উপর আবার ইউরেনিয়াম ছাড়া আর এক স্তর ইট বসানো হলো এবং এভাবেই চললো।

জ্বালানী দেবার মতো এতে কোনো 'ফায়ার বক্স' (জায়গা) ছিল না! ইউরেনিয়ামই হলো জ্বালানী। কতকগুলি ইটের কোণ এই জ্বালানী দিয়েই তৈরি হয়েছে। এই হলো চুল্লীর সবকিছু—বেশ বড় একটা ইটের স্তূপ মাত্র। পারমাণবিক চুল্লীকে এখনও সাধারণত 'পাইল' (স্তূপ) বলা হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা এক অদ্ভুত কায়দায় তাঁদের চুল্লী তৈরি করেছিলেন। পরমাণু ভেঙে তাঁরা এক নতুন রকমের উত্তাপ সৃষ্টির চেষ্টা

করেছিলেন।

যে সব পদার্থের দ্বারা পৃথিবী গঠিত, তাদের ক্ষুদ্রতম কণিকা হলো পরমাণু। পৃথকভাবে এক-একটি পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে, চোখে দেখা তো দূরের কথা, সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্রেও কেউ কখনও তাকে দেখতে পায়নি।

যাহোক, বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে, একটা ভারি কেন্দ্রীয় পদার্থ নিয়ে পরমাণু গঠিত। এই কেন্দ্রীয় পদার্থকে বলা হয় নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক, যার চতুর্দিকে ইলেক্ট্রন নামে কতকগুলি অস্পষ্ট শক্তি-বিন্দু ঘুরে বেড়ায়। তাঁরা আরও জানেন যে, পরমাণুর মধ্যে অনেক জায়গাই শূন্য। পরমাণুর এই কেন্দ্রীয় বস্তু যদি একটা বেসবলের মতো বড় হতো তাহলে তার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রনগুলি থাকতো প্রায় আধ মাইল তফাতে। নিউক্লিয়াসটি যদি আরো বড় হতো, তাহলে যে ইলেক্ট্রনগুলি দেখানো হয়েছে, সেগুলি বইয়ের পৃষ্ঠা ছেড়ে রাস্তা পেরিয়ে পরবর্তী ব্লকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যেতো। [এই বই-এ ছবিটি নেই]।

এই কাহিনীটি শুধু মাত্র পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু নিয়ে।

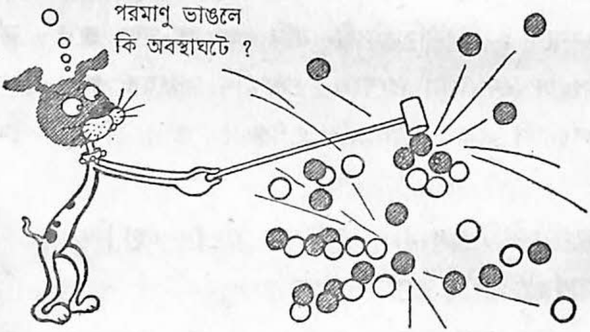
পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুকে ভেঙে ফেললে—যে প্রচণ্ড শক্তি তাকে একত্রিত করে ধরে রাখে—সেই শক্তি মুক্ত হয়ে যায় এবং বিস্ফোরণ উত্তাপের সৃষ্টি করে।

ইউরেনিয়ামই পারমাণবিক চুল্লীর জ্বালানী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল ; কারণ এতে সহজ বিভাজনক্ষম এক রকমের পরমাণু আছে। এক টুকরো বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের মধ্যে অল্প কয়েকটি পরমাণু সর্বদাই আপনা-আপনি ভেঙে যায়।

বৈজ্ঞানিকেরা এমন একটা বিভাজনক্ষম পরমাণু খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিলেন, যেটা অন্য আর একটা পরমাণুকে ভাঙতে পারবে এবং সেটা আবার অন্য আর একটাকে ভাঙবে এবং ক্রমাগত এভাবেই চলবে। শিকলের মতো সূত্রাবদ্ধ ভুঁইপটকার একটাতে অগ্নি-সংযোগের

ফলে যেমন একটার পর একটা পরপর ফাটতে থাকে, ঠিক সেইভাবে কোটি কোটি পরমাণু নিজেদের দ্বারাই বিভাজিত হবে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃত প্রস্তাবে এই ব্যাপারটাকে 'চেন রিঅ্যাক্‌শন' বা শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া নামেই অভিহিত করেছেন।

ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থ ক্ষুদ্র হলেও সেটা তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর অনেকগুলি কণিকা নিয়ে গঠিত। পরমাণু ভেঙে যাবার সময় এই কণিকাগুলি ছিটকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং দুটি ক্ষুদ্রতর পরমাণুতে পুনরায় সম্মিলিত হয়—যেগুলি মোটেই ইউরেনিরাম পরমাণু নয়। সেগুলি টিন, আয়োডিনের মতো অন্যান্য যে কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণু হতে পারে।



এই নতুন পরমাণুগুলিতে মূল ইউরেনিয়াম পরমাণুর দুটি কি তিনটি কণিকার প্রয়োজন নেই। এই কণিকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুলেটের মতো সেকেণ্ডে প্রায় ১০,০০০ মাইল ছিটকে বেরিয়ে যায়। এই গতিবেগে উড়ে গেলে, নিউইয়র্ক থেকে হলিউডে পৌঁছে আবার ফিরে আসা—এরূপ দু'বার যাতায়াতে একখানি এরোপ্লেনে মাত্র এক সেকেণ্ড সময় লাগবে।

এরূপ ছুটে-যাওয়া কোনো একটা বুলেট যখন একই রকমের অন্য কোনো পরমাণুকে আঘাত করে, তখন সেটাকেও সে ভেঙে ফেলবে।

যাহোক, ইউরেনিয়ামের মধ্যে যতগুলি পরমাণু আঘাত লেগে ভেঙে যায়, তাদের প্রত্যেকটির অনুপাতে তার মধ্যে অধিকতর ভারি আরও শতাধিক সমগোত্রীয় পরমাণু থেকে যায়, যেগুলি মোটেই ভাঙে না। প্রকৃত পক্ষে, ছিটকে-আসা বুলেটগুলি বিভাজনক্ষম কোনো পরমাণুকে আঘাত করবার পূর্বেই এসব ভারি পরমাণু তাদের ধরে ফেলে এবং আটকে রাখে।

বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন যে, বিভাজিত ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত বুলেটগুলি যখন গ্র্যাফাইটের ভিতর দিয়ে যায়, তখন তাদের গাত মন্দীভূত হয়। তাদের মধ্যে অনেকগুলিই আবার—বিভাজিত হয়নি, এরূপ শক্ত পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়ে এবং অবাধে ছুটে গিয়ে বিভাজনক্ষম অপর কোনো পরমাণুকে আঘাত করে। মন্থর গতিবেগ ঠিক রকমের পরমাণু বিভাজনে বুলেটগুলিকে বাধা দেয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে, গতিবেগ মন্দীভূত হলেই সেগুলি ভালোরকম কাজ করতে পারে।

এই কারণেই পারমাণবিক চুল্লীতে গ্র্যাফাইটের ইট ব্যবহার করা হয়।

পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণে বিজ্ঞানীরা কী পরিমাণ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করেছেন, সেটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আশা করা হয়েছিল যে, ইটের স্তূপ যদি যথাযথরূপে বড় করা হয়, তাহলে চুল্লীর কাজ আপনা-আপনিই শুরু হয়ে যাবে।

এক খণ্ড ইউরেনিয়ামে যদিও কয়েকটি পরমাণু অনবরতই বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে, তথাপি একক পরমাণু খুবই কম। যখন একটি মাত্র পরমাণু বিভাজিত হয়, তখন কিছু একটা ঘটছে বলে বলা যায় না। এ থেকে যে-সব বুলেট ছিটকে বেরিয়ে আসছে, যদি তার চারদিকে সুবিধামত লক্ষ্যস্থল পাবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম না থাকে, তাহলে তাদের পক্ষে অপর একটি পরমাণুকে আঘাত করে বিভাজিত করবার সম্ভাবনা খুবই কম।

পরমাণুর মধ্যে অধিকাংশই শূন্যতা, কাজেই তাদের কেন্দ্রকগুলিও অপেক্ষাকৃত অনেক দূরে অবস্থিত। ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে অনেক বুলেটই কাউকে আঘাত না করে বাতাসের মধ্যে চলে যাবে। ইউরেনিয়াম যদি সন্ধি-পরিমাণের কম হয়, তাহলে কোনো অবস্থাতেই পারমাণবিক চুল্লী বা পারমাণবিক বোমাকে কার্যকরী করে তোলা সম্ভব হবে না।

ব্যাপারটা হবে এ-রকম—ধর, তুমি যেন চোখ-বাঁধা অবস্থায় একটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ—চারদিকে কয়েকবার ঘোরবার পর একটা বন্দুক ছুঁড়লে। মাঠের মধ্যে যদি দুটো কি তিনটে গাছ থাকে, তাহলে সম্ভবত একটা গাছকেও গুলিবিদ্ধ করতে পারবে না।

কিন্তু তোমার চারদিকে যদি হাজার হাজার গাছ থাকতো, তাহলে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির না করেও কোন একটা গাছকে সম্ভবত গুলিবিদ্ধ করতে পারতে।

বিভাজিত পরমাণু থেকে নির্গত বুলেটগুলির পক্ষেও ঠিক এ কথাই সত্য। তাদেরও লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাগ করে ছোঁড়া হয় না। কিন্তু চতুর্দিকে অন্যান্য পরমাণু যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে—পারমাণবিক চুল্লীতে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যদি বেশি থাকে—তাহলে কতকগুলি বুলেট অন্যান্য পরমাণুকে আঘাত করে ভেঙে ফেলবে।

বৈজ্ঞানিকেরা ধীরে ধীরে তাঁদের গ্র্যাফাইট ও ইউরেনিয়াম 'পাইল' গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের এই ধারণা যদি কার্যকরী হয়, তাহলে প্রচণ্ড তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক রশ্মিও নির্গত হবে।

পারমাণবিক চুল্লী একবার সক্রিয় হয়ে উঠলে অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করতে থাকে। সেগুলিকে চোখে দেখা যায় না, তাদের গন্ধ পাওয়া যায় না, শোনা যায় না অথবা অনুভব করাও যায় না। কিন্তু সেই রশ্মি যে কোনো জীবন্ত পদার্থকে মেরে ফেলতে পারে।

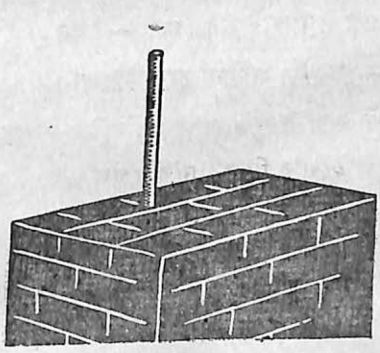
প্রথম যে পারমাণবিক চুল্লীটি নির্মিত হয়েছিল, তার চারদিকে

কোনো কংক্রিটের আবরণী ছিল না। একবার সক্রিয় হয়ে উঠতেই কর্মীদের নিরাপত্তার জন্যে সেটাকে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হয়।

তাঁদের নিঃশব্দ চুল্লীটা কখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেটা জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা সেই স্তূপের (পাইলের) গভীরে অনুভূতিশীল যন্ত্র প্রোথিত করেছিলেন। তাছাড়া 'পাইলে'র মধ্যে তাঁরা ক্যাডমিয়ামের কয়েকটি রড-ও (দণ্ডও) ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। পরীক্ষা করে দেখবার সময় না-হওয়া পর্যন্ত চুল্লী যাতে সক্রিয় না হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনমত তার ক্রিয়া বন্ধ রাখবার জন্যে এই রডগুলি ব্যবহার করা হতো।

ক্যাডমিয়াম এমনই একটা ধাতু, যা বিভাজনরত পরমাণু থেকে নির্গত ছুটন্ত বুলেটগুলিকে থামিয়ে দিতে পারে। বুলেটগুলি ক্যাডমিয়ামের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখানেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। বিভাজনরত পরমাণুগুলির শৃঙ্খল ভেঙে যায়।

প্রথম যে চুল্লীটি তৈরি হয়েছিল, তাতে ক্যাডমিয়ামের তিনটি রড ছিল। এই রডগুলিকে চুল্লী থেকে বের করে নেওয়া যেত। সেগুলিকে বের করে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই 'পাইলে'র ভিতরে ইটের মধ্যে প্রোথিত



সূক্ষ্মানুভূতিশীল যন্ত্রের সাহায্যে জানা যেত—চুল্লীর কাজ শুরু হয়েছে কিনা। রডগুলির একটা ছিল স্বয়ংক্রিয়। সেটা একটা মোটরের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হতো। চুল্লীর সক্রিয়তা বিপজ্জনকভাবে তীব্র হয়ে উঠলে মোটর সেটাকে পুনরায় চুল্লীর ভিতরে ঢুকিয়ে দিত।

দ্বিতীয় রডটাকে কর্মীরা বলতো 'জিপ' (Zip)। সেটা থাকতো একটা দড়ির সঙ্গে সংলগ্ন। দড়িটাকে একটা পুলির (কপিকলের) ভিতর দিয়ে চালিয়ে নেবার পর তার প্রান্তভাগটা ভারি একটা ওজনের সঙ্গে বাঁধা থাকতো। এই রডটাকে চুল্লীর বাইরে টেনে আনবার পর সেই দড়িটাকে আর একটা দড়ি দিয়ে নীচের দিকে টেনে রাখা হতো। সেখানে একজন লোক কুঠার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং সেই দড়িটাকে কেটে দেওয়া মাত্রই রডটা আবার সড়াৎ করে 'পাইলে'র ভিতরে ঢুকে যেত।

তৃতীয় রডটাকে হাতে করেই চালানো হতো।

১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বরের মধ্যে বিজ্ঞানীরা প্রায় ছয় টন ইউরেনিয়াম ধাতু তাঁদের 'পাইলে'র মধ্যে ব্যবহার করেন।

তখন ছিল দৈনিক পরীক্ষার সময়।

ক্যাডমিয়ামের রড্‌গুলিকে ধীরে ধীরে টেনে বের করা হলো। 'গাইগার কাউন্টার'গুলিতে জোরে জোরে শব্দ শুরু হলো—সেগুলি গর্জন করে উঠলো—যন্ত্রগুলি তখন উন্মত্ত হয়ে উঠলো।

ইউরেনিয়াম এবং গ্র্যাফাইটের স্তূপ—তখন পর্যন্ত যেগুলি শান্ত এবং নিষ্ক্রিয় ছিল—সেগুলি সক্রিয় হয়ে উঠলো।

মোটর শোঁ শোঁ শব্দ করতে লাগলো, দড়ির উপর কুঠারের কোপ পড়লো, রডগুলি 'পাইলে'র ভিতর ঢুকে গেল।

রডগুলিও কাজে লেগে গেল।

চুল্লীর কাজ বন্ধ হলো।

ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ডাঃ এনরিকো ফার্মির উপর 'পাইল' নির্মাণের দায়িত্ব ছিল। ডাঃ আর্থার কম্পটন নামে একজন সহকর্মী তৎক্ষণাৎ এই গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় খবরটি ওয়াশিংটনে কর্তৃপক্ষকে ফোন করে জানালেন।

খবরটা ছিল সাঙ্কেতিক এবং তাতে এরূপ বলা হয়েছিল :

"ইটালিয় নাবিক আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন।"

"দেশের ভিতরে প্রবেশ করা নিরাপদ কি ?"

"হাঁ কলম্বাস দেখছেন—স্থানীয় অধিবাসীরা বন্ধুত্বের মনোভাব-সম্পন্ন।"

এই সাঙ্কেতিক খবরের অর্থ হলো এই যে, চুল্লীতে শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং তাকে নির্বিঘ্নে বন্ধ করাও সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ এইমাত্র সর্বপ্রথম প্রমাণ করলো যে, পারমাণবিক শক্তিকে সে মুক্ত করতে পারে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারে।

পৃথিবী এক নতুন যুগে প্রবেশ করলো।

পরবর্তীকালে অবশ্য পারমাণবিক চুল্লীর অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। কোণে ইউরেনিয়াম বসানো গ্র্যাফাইট ইটের পরিবর্তে 'পাইলে'র স্তর নির্মাণের জন্যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় গ্র্যাফাইট ব্লক ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই গ্র্যাফাইটের মধ্যে গর্ত করে লম্বা লম্বা ইউরেনিয়ামের আধার (পাত্র) তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই জ্বালানী অপসারণ এবং পুনঃস্থাপন করা যায়। মারাত্মক রশ্মির কবল থেকে কর্মীদের নিরাপদে রাখবার জন্যে চুল্লীগুলিকে ৫০ টন বা আরও বেশি কংক্রিটের গাঁথুনি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়।

একটা পারমাণবিক চুল্লী থেকে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হতে পারে তা প্রায় ধারণার অতীত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ওয়াশিংটন স্টেটে যে সব পারমাণবিক চুল্লী চালু করা হয়েছিল, সেগুলিকে উত্তর-পশ্চিমের বৃহত্তম কলাম্বিয়া নদীর জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা হতো। উত্তাপের মাত্রা এতই তীব্র ছিল যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে সমগ্র নদীর জলের তাপমাত্রার বৃদ্ধি লক্ষিত হয়।

এই উত্তাপকে বাষ্প অথবা বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিবর্তিত করা যেতে পারে এবং সেই অবস্থায় এর সাহায্যে বসত-বাড়ি, অফিস-গৃহ, কলকারখানা ইত্যাদি আলোকিত করা ও গরম রাখা এবং কলকারখানার যন্ত্রপাতি চালানো যেতে পারে।

বাড়িঘরের জন্যে এই শক্তিকে 'বৃহৎ প্ল্যান্ট' (শক্তি-উৎপাদক কেন্দ্র) থেকে বিদ্যুৎ বা বাষ্পের আকারে পাওয়া যাবে, কিন্তু বাড়িতে স্থাপিত পারমাণবিক চুল্লী থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ পারিবারিক ব্যবহারের পক্ষে এসব চুল্লী যেমন বড় ও ব্যয়সাপেক্ষ তেমনই আবার বিপজ্জনক।

বড় বড় জাহাজ, রেল-ইঞ্জিন—এমন কি, বড় বড় উড়োজাহাজের জন্যে এই চুল্লী শক্তি সরবরাহ করতে পারে বটে, কিন্তু মোটর গাড়ির জন্যে পারে না। পারমাণবিক চুল্লীকে নিরাপদ করবার জন্যে এখন যে ৫০ টনের মতো কংক্রিটের প্রয়োজন, তার চাপেই মোটর গাড়ি পিষে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

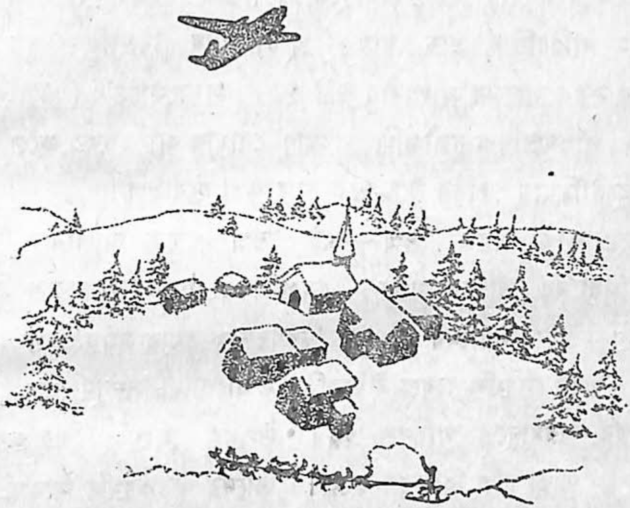
পারমাণবিক চুল্লীকে চালু রাখবার জন্যে খুব সামান্যই জ্বালানীর প্রয়োজন হয়।

১০ ঘন ইঞ্চি পরিমাপের সহজ বিভাজনক্ষম একটি ইউরেনিয়াম খণ্ড পারমাণবিক চুল্লীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 'দগ্ধ' হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হলে দশ দিনেরও বেশি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বাড়িঘর, অফিস প্রভৃতি আলোকিত করা, গরম রাখা এবং কলকারখানাগুলিকে চালু রাখবার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করতে পারে।

কোনো পারমাণবিক চুল্লীতে আধ টন ইউরেনিয়াম শক্তিতে রূপান্তরিত হলে ১১,৪০০,০০০,০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টার শক্তি উৎপাদন করবে। গড়পড়তা চারজন লোকের একটি পরিবারের রেফ্রিজারেটর, বৈদ্যুতিক মিশ্রণ যন্ত্র, রুটি সেঁকবার যন্ত্র এবং সব রকমের বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি চালু রাখবার পক্ষে সত্তর লক্ষ, তিন শত সাত হাজার, ছয় শত দুই বছর, তিন মাসের জন্যে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি যথেষ্ট।

পারমাণবিক চুল্লী চালু রাখবার জন্যে জ্বালানী চালান দেওয়া একটা সমস্যাই নয়। সারাটা শীতকাল অ্যালাস্কার সমগ্র ফেয়ারব্যাঙ্কস্ শহরকে গরম রাখবার জন্যে প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম একখানা উড়োজাহাজই বয়ে নিয়ে যেতে পারে। এতে কোনো ধোঁয়া হয় না বলে

শহর ও তার চতুর্দিক বরফের মতো পরিষ্কার থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে পারে, যেখানে এতদিন জ্বালানী প্রেরণ করা সম্ভব ছিল না।



শক্তি উৎপাদনের জন্যে পারমাণবিক চুল্লী ব্যবহারকারী বড় বড় এরোপ্লেন অথবা জাহাজ এক-শ বছর ধরে চলবার মতো প্রয়োজনীয় জ্বালানী বহন করতে পারে। কার্যত অবশ্য এত বেশি জ্বালানী বয়ে বেড়াবার কোনই প্রয়োজন নেই।

এক সময়ে আমরা এই ভেবে উদ্বেগ বোধ করছিলাম যে, পৃথিবীর সব তেল ও কয়লা যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন কি হবে? পারমাণবিক শক্তি এর একটা জবাব দিতে পারে।

পারমাণবিক চুল্লীর এই আশ্চর্য কাহিনী ছাড়া আরও একটা অংশ আছে। ইউরেনিয়াম জ্বালানীর পাত্রগুলির মধ্যে বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছে।

একটা জিনিস হচ্ছে—ঐসব বিভাজনক্ষম পরমাণুর সঙ্গে সমগোত্রীয় যেসব ভারী পরমাণু থাকে—ছিটকে আসা বুলেটের আঘাতে যেগুলি

ভেঙে যায় না—তাদের মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার ঘটে।

তারা কতকগুলি বুলেট শোষণ করে নেয় এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিভাজনে অক্ষম এই ভারী ইউরেনিয়াম পরমাণুগুলি সম্পূর্ণরূপে অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। সেগুলি প্লুটোনিয়ামে পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্লুটোনিয়াম বিভাজিত হয়। ঐ চুল্লীতে নতুন রকমের জ্বালানীর সৃষ্টি হয়। হ্যানফোর্ডের (ওয়াশিংটন) বিরাট পারমাণবিক চুল্লীগুলি পরমাণু বোমায় ব্যাবহারের জন্যে কেবল মাত্র প্লুটোনিয়াম তৈরির উদ্দেশ্যেই চালু করা হয়েছিল।

তাছাড়াও আছে 'ভস্ম'—এই 'ভস্ম' থাকে জ্বালানীর ভিতরে, ইউরেনিয়ামের পাত্রের মধ্যে। সেগুলি হলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর পরমাণু—ইউরেনিয়ামের-পরমাণু দ্বিধাবিভক্ত হবার সময় সেগুলি গঠিত হয়। তখন সেগুলি অবশ্য ইউরেনিয়াম থাকে না, সম্পূর্ণ ভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হয়। উপরন্তু সেগুলি তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকে। তারা রশ্মি বিকিরণ করে। তাদের কতকগুলি আবার হাজার হাজার বছর ধরে রশ্মি বিকিরণ করবে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি দূরীভূত করতে হবে এবং অবশিষ্ট অদগ্ধ ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম ইন্ধন হিসেবে পুনরায় চুল্লীতে দেওয়া যেতে পারে। তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি সরিয়ে না নিলে সেগুলি এত বুলেট শোষণ করে নেবে যে, তার ফলে চুল্লীর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

ইউরেনিয়াম ইন্ধন-পাত্র থেকে তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলিকে সরিয়ে নেওয়া খুবই কষ্টকর এবং বিপজ্জনক। যা হোক, এটা আবিষ্কৃত হয়েছে যে, প্রায় যে কোনো পদার্থের একটা নল যদি চুল্লীর ভিতরে এমন জায়গায় স্থাপন করা যায়, যেখানে বিভাজনরত পরমাণু থেকে নির্গত বুলেটগুলি তাকে আঘাত করতে পারে, তাহলে সেটা তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠবে।

মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর এই সব তেজস্ক্রিয় পরমাণু বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার স্বরূপ। এগুলিকে বলা হয়, 'Tagged Atoms' বা চিহ্নিত পরমাণু। এই পরমাণুগুলিকে 'গাইগার কাউণ্টার' অথবা ক্যামেরার সাহায্যে খুঁজে বের করা যায়। চোখের পক্ষে অদৃশ্য হলেও ফোটোগ্রাফের ফিল্মে এই রশ্মির ছাপ তোলা যায় এবং এরা নিজেদের ছবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়—বাড়ন্ত উদ্ভিদ সামান্য পরিমাণে দস্তা গ্রহণ করে; কিন্তু কেন গ্রহণ করে, বৈজ্ঞানিকেরা তা জানেন না। পারমাণবিক চুল্লীতে দস্তা রেখে তাকে তেজস্ক্রিয় করে তোলা যায়। তারপর সেই দস্তা টোম্যাটো গাছের চারিদিকের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। শিকড় সেই দস্তা শোষণ করে নেয় এবং তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলি গাছের কাণ্ড দিয়ে উপরে উঠে যায়। 'গাইগার কাউন্টারে'র খুট খুট আওয়াজ থেকে বিজ্ঞানী তার গতিপথ অনুসরণ করতে পারেন। দস্তা টোম্যাটোর মধ্যে প্রবেশ করবার পর সেটাকে আধাআধিভাবে কেটে ফেলে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে তার ফোটো নেওয়া হয়। দস্তার পরমাণু থেকে যে রশ্মি বিকিরিত হয়, তাই ফিল্মের উপর মুদ্রিত হয়ে যায়।

পারমাণবিক চুল্লীতে পরমাণুকে তেজস্ক্রিয় করা হলে সেগুলি—

(১) উৎপাদনকারীদের উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে;

(২) উৎকৃষ্টতর শস্য-উৎপাদনে কৃষকদের সাহায্য করতে পারে;

(৩) আমাদের শরীর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানাতে পারে এবং কেমন করে ভালো থাকা যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে পারে;

(৪) আমাদের প্রত্যেকের উপকারের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই নতুন তথ্যাদির আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য করতে পারে;

এমন কি—উদ্ভিদেরা জলের হাইড্রোজেন, বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং সূর্যালোকের সাহায্যে কেমন করে খাদ্য প্রস্তুত করে, এই সব তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা সে-সব তথ্যও আবিষ্কার

করতে পারেন। যখন এরূপ ব্যাপার ঘটবে, তখন আমরা এই সরল পদার্থগুলিকে—পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, তার চেয়ে আরও অধিক পরিমাণ খাদ্যবস্তুতে পরিবর্তিত করতে পারবো।

পারমাণবিক চুল্লী যেমন উপকারী, পারমাণবিক বোমা আবার তেমনই ধ্বংসকারী। এটা অনেকটা একই রকমে কাজ করে।

দুই রকমের পরমাণু দিয়ে ইউরেনিয়াম গঠিত। বিভাজনক্ষম প্রত্যেকটি পরমাণুর অনুপাতে এক শতেরও বেশি অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণু থাকে, যেগুলি বিভাজিত হয় না। পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্যে হালকা পরমাণুগুলিকে অপরগুলি থেকে পৃথক করে একত্রিত করা হয়। এটা একটা জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।

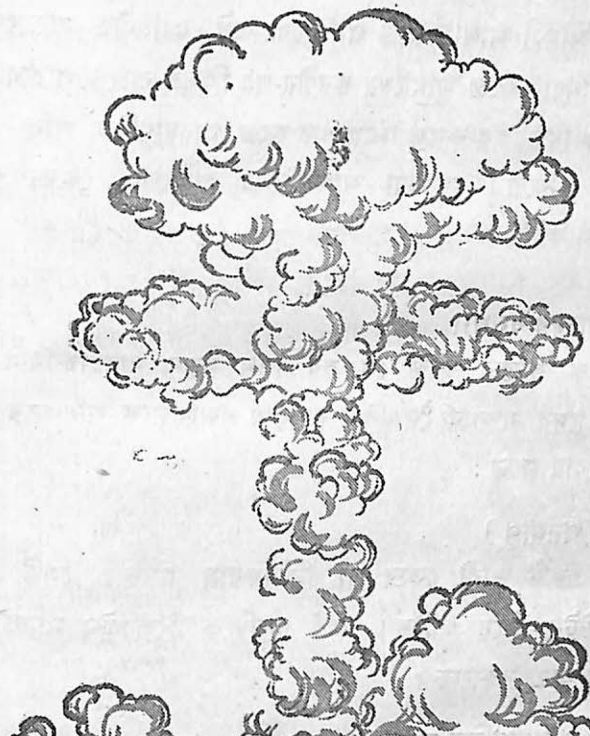
ছোট এক টুকরো ইউরেনিয়ামে শুধু যদি সহজ বিভাজনক্ষম পরমাণু থাকে, তবুও সেটা বিস্ফোরিত হবে না এবং কোনো কিছুই তাতে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে না। পরমাণু বিভাজনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুলেটের অনেকগুলিই বাতাসের মধ্যে বেরিয়ে যায়। কিন্তু টুকরোটা যদি যথেষ্ট বড় হয়, অর্থাৎ দুই পাউণ্ডেরও বেশি হয়, তবে বিস্ফোরণ অনিবার্য। পারমাণবিক বোমা যখন ছোঁড়া হয়, তখন বোমার ভিতরের ছোট ছোট ইউরেনিয়ামের টুকরোগুলি যান্ত্রিক কৌশলে একত্রিত হয়ে বিস্ফোরণের উপযোগী বড় একটা টুকরোয় পরিণত হয়।

প্লুটোনিয়ামও 'পৃথকীকৃত ইউরেনিয়ামের' মতো একই রকমে কাজ করে এবং ইউরেনিয়ামের পরিবর্তে পারমাণবিক বোমার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

একটা আতসবাজী তৈরি করতে কেউ এক চিমটি পারমাণবিক পদার্থ ব্যবহার করতে পারে না। ক্রিয়াশীল হতে পারে, এরূপ অতি সামান্য পরিমাণও একটা শহরকে ধ্বংস করে ফেলবে।

বিশেষ কোনো অবস্থায় ছোট্ট একটি গ্যাসোলিন-পাত্র বিস্ফোরিত হলে একটা বাড়ি বিধ্বস্ত করে ফেলতে পারে। যুদ্ধের সময়ে এই পদার্থ অগ্নিপ্রক্ষেপক যন্ত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু

গ্যাসোলিন বিপজ্জনক হলেও আমরা আমাদের সব গ্যাস-স্টেশনগুলি বন্ধ করে দিইনি।



আমরা গ্যাসোলিন ব্যবহারের উপায় শিখেছি এবং একে আমাদের মোটর গাড়ি, ট্রাক, বাস, ট্র্যাক্টর এবং বিমান চালাবার কাজে লাগিয়েছি।

যে পারমাণবিক শক্তি বোমায় ব্যবহৃত হয়, তা আমাদের সভ্যতা ধ্বংস করে দিতে পারে।

যে পারমাণবিক শক্তি পারমাণবিক চুল্লীতে ব্যবহৃত হয়, মোটর গাড়িতে ব্যবহৃত গ্যাসোলিনের মতই তা নিরাপদ হতে পারে। এটি

আমাদের জীবনকে সহজতর করে তুলতে পারে এবং জীবনে অধিকতর আনন্দ উপভোগের জন্যে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

এখন থেকে হাজার বছর পরে যখন পারমাণবিক চুল্লীর কাহিনী বলা হবে, আমরা আশা করতে পারি যে, এই কাহিনীর সন্তোষজনক যবনিকা টানবার জন্যে আমাদের করণীয় সব কিছুই করতে পারবো।

অনেক বিস্ময়কর কাজে নিয়োগের জন্যে পারমাণবিক শক্তি এখন আমাদের আয়ত্তে। আমরা আলাদিনের প্রদীপের দৈত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি।

ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা

পারমাণবিক শক্তির জন্যে যে সব নতুন নতুন ব্যবহার-বিধি গড়ে উঠছে, তাদের সম্পর্কে দৈনন্দিন ব্যবহার্য শব্দগুলিকে অধিকতর সহজ-বোধ্য করবার জন্যে :

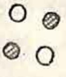
অ্যাটম্ (পরমাণু)

পরমাণুর একটি ভারী কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আছে। সেটি প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে গঠিত। এর চতুর্দিকে ইলেকট্রন নামক শক্তি-বিন্দুগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা

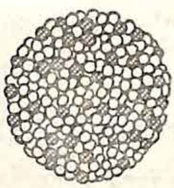
নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা।

হিলিয়াম কেন্দ্রক



প্রোটন = ২
নিউট্রন = ২
পারমানবিক সংখ্যা = ২

ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক



প্রোটন = ৯২
নিউট্রন = ১৪৬
পারমানবিক সংখ্যা = ৯২

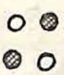
পারমাণবিক উনুন

পারমাণবিক চুল্লীর অন্য এক নাম। এগুলিকে সময় সময় ইউরেনিয়াম স্তূপ (পাইল) বা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরও বলা হয়।

পারমাণবিক ওজন

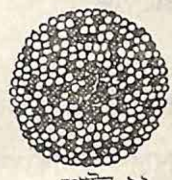
একটি পরমাণুর ওজন নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রনের একত্রিত ওজনের প্রায় সমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, সব ইউরেনিয়াম পরমাণুর ৯২টি প্রোটন আছে। বিভাজনক্ষম অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা পরমাণুগুলির ১৪৩টি নিউট্রন থাকে। এই হাল্‌কা পরমাণুগুলির ওজন ২৩৫ ইউনিট (একক) এবং এগুলিকে বলা হয় ইউরেনিয়াম—২৩৫ (৯২+১৪৩)। সমগোষ্ঠীর ভারী পরমাণুগুলিতে থাকে ১৪৬টি নিউট্রন। এদের বলা হয় ইউরেনিয়াম—২৩৮।

হিলিয়াস কেন্দ্রক



প্রোটন ২
নিউট্রন + ২
পারমানবিক ওজন = ৪

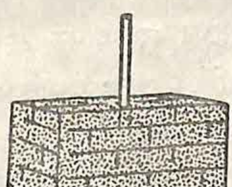
ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক



প্রোটন ৯২
নিউট্রন + ১৪৬
পারমানবিক ওজন = ২৩৮

ক্যাডমিয়াম

টিনের মতো সাদা এক রকম ধাতু। এর পরমাণুগুলি ছুটন্ত নিউট্রন বুলেটগুলিকে শোষণ করে ধরে রাখতে পারে। পারমাণবিক চুল্লীর



শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া বন্ধ করবার জন্যে সচরাচর এই পদার্থটিকেই ব্যবহার করা হয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া

কাঠ, কয়লা বা তেলের দহন অথবা ডিনামাইট বা টি. এন. টি-র বিস্ফোরণ হলো রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। বাতাসের অক্সিজেনের পরমাণু জ্বালানীর পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়। পরমাণুর বাইরের আবরণ গঠনকারী ইলেকট্রনগুলিই কেবল এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থ বা নিউক্লিয়াস অপরিবর্তিত থাকে। এই কারণেই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার চেয়ে কম শক্তিশালী।

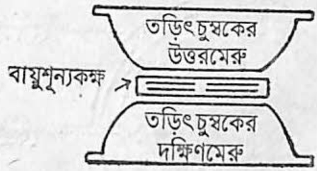
মেঘ-প্রকোষ্ঠ

পারমাণবিক গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। পরমাণু কেউ কখনও চোখে দেখেনি ; কিন্তু বাষ্পপূর্ণ একটি বাক্সের (মেঘ-প্রকোষ্ঠ) ভিতর দিয়ে পারমাণবিক কণিকা অতিক্রম করবার সময় চোখে দেখবার মতো একটি পথচিহ্ন রেখে যায়।

কস্‌মিক-রে (মহাজাগতিক রশ্মি)

বহিরাকাশ থেকে আগত যে-সব পারমাণবিক কণিকা (প্রোটন) এসে পৃথিবী-পৃষ্ঠে আঘাত করে। এগুলি হয়তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপর কোনো অংশে উৎপন্ন, পদার্থের ধ্বংসজনিত উপজাত বস্তু হতে পারে। এরা বায়ুমণ্ডলের পরমাণুগুলিকে ভেঙে অন্যান্য পারমাণবিক কণিকা মুক্ত করে দেয়। পরমাণুর বিভিন্ন অংশের বিষয় অনুসন্ধানের সহায়ক হিসেবে মহাজাগতিক রশ্মি বৈজ্ঞানিকদের নিকট অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার স্বরূপ।

সাইক্লোট্রন



নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরমাণু ভাঙবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে অল্প-কিছু পরমাণু চূর্ণ করবার এক রকম যন্ত্র।

আইনস্টাইনের সূত্র

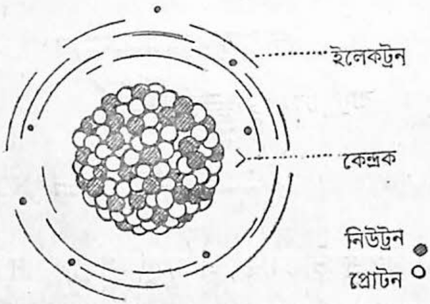
আইনস্টাইন যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, পদার্থ ও শক্তি পৃথক প্রতীয়মান হলেও মূলত একই জিনিসের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। ১৯০৫ সালে তিনি একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন, যার দ্বারা দেখানো যায়—পদার্থকে শক্তিতে পরিবর্তিত করলে কতটা শক্তি উৎপন্ন হবে এবং বর্তমানে সেটা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর সূত্রটা হচ্ছে এই :

$$E = mc^2$$

এর অর্থ হলো—শক্তি হবে (E)-আলোর গতিবেগের (সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) বর্গফলকে $(c)^2$ 'ভর' (m) দিয়ে গুণ করলে যা হয়, তার সমান। তাঁর এই সূত্র অনুসারে, এক পাউণ্ড ওজনের কোনো পদার্থকে শক্তিতে পরিবর্তিত করলে ১১,৪০০,০০০,০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা শক্তি পাওয়া যাবে। আধুনিক পারমাণবিক চুল্লী এবং বোমা, পদার্থের এক শতাংশের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র শক্তি মুক্ত করে।

তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি নির্গত হয়। এদের মধ্যে গামা রশ্মিই সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক, কারণ এর ভেদকারী শক্তি খুব বেশী।

ইলেকট্রন



পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে যে সব অস্পষ্ট শক্তিবিন্দু ঘুরে বেড়ায়। প্রত্যেকটি ইলেকট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুতাধান বহন করে, কিন্তু এতে পরমাণুর ওজনের কিছু বৃদ্ধি ঘটে না বললেই চলে। ১৮৫০টি ইলেকট্রন একত্রে ওজন করলে একটা প্রোটন অথবা একটা নিউট্রনের সমান হতে পারে। রেডিওর টিউবের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েই রেডিওকে কাজ করায়।

ইলেকট্রোস্কোপ

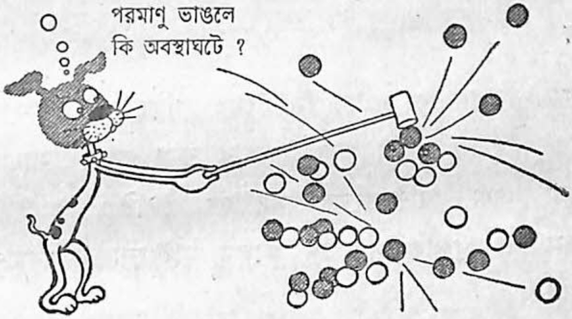
বাতাসের মধ্যে বিকিরণের বিপজ্জনক প্রাচুর্য ঘটলে, সেটা নির্ধারণ করবার একরকম যন্ত্র।

মৌলিক পদার্থ (Element)

আমাদের পরিচিত যে ৯৬টি মূল উপাদানের দ্বারা পৃথিবীর সবকিছু গঠিত, তাদের প্রত্যেকটি হলো মৌলিক পদার্থ। টিন, সোনা, ইত্যাদি যাবতীয় মৌলিক পদার্থের পরমাণু একই সংগঠক বস্তু—প্রোটন, নিউট্রন, এবং ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত। নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটনের সংখ্যাই মৌলিক পদার্থ নির্ধারণ করে।

নিউক্লিয়াসে ৯২টি প্রোটন থাকলে সেই মৌলিক পদার্থটি হবে ইউরেনিয়াম। একটিমাত্র প্রোটন থাকলে সেটা হবে হাইড্রোজেন।

২৬টি প্রোটন থাকলে সেটা হবে লোহা। ৭৯টি প্রোটন থাকলে সেটা হবে সোনা। যখন একটি ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজিত হয়, তখন ৯২টি প্রোটন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ছুটি পরমাণুতে পুনর্বিন্যস্ত হয়। এই ক্ষুদ্রতর পরমাণুগুলি পূর্বেকার মৌলিক পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; কারণ, মূল পরমাণুর ৯২টি প্রোটন দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই নতুন পরমাণুর কোনটিতেই ৯২টি প্রোটন থাকতে পারে না!



'হাফ-লাইফ' (অর্ধ-জীবন)

তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভেঙে যাবার নির্দিষ্ট গতিবেগের হার বোঝাবার জন্যে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। কতকগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধ-জীবন কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। অপর পক্ষে ইউরেনিয়াম—২৩৮-এর অর্ধ-জীবন হলো চার-শ' কোটি বছর। এর অর্থ হলো—এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম নিজে নিজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চার-শ' কোটি বছর পরে আধ পাউণ্ডে পরিণত হবে। অপর আধ পাউণ্ড সীসায় পরিবর্তিত হবে।



অবশিষ্ট আধ পাউণ্ড নিজে নিজে ভেঙে গিয়ে আরও চার-শ' কোটি বছর পরে সিকি পাউণ্ডে পরিণত হবে। এই সিকি পাউণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আট ভাগের এক ভাগ পাউণ্ডে পরিণত হবে আরও চার-শ' কোটি বছর পরে এবং এই ভাবেই চলবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে উপযুক্ত অর্ধ-জীবনকালের পদার্থ ব্যবহার করে কার্যকরী বিকিরণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

ভারী জল

সময়ে সময়ে পারমাণবিক চুল্লীতে নিউট্রনের গতিবেগ কমাবার জন্যে গ্রাফাইটের পরিবর্তে ভারী জল ব্যবহার করা হয়। সাধারণ জল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমবায়ে তৈরি। ভারী জলের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি সাধারণ জলের হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে দ্বিগুণ ভারী।

সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণু — ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু

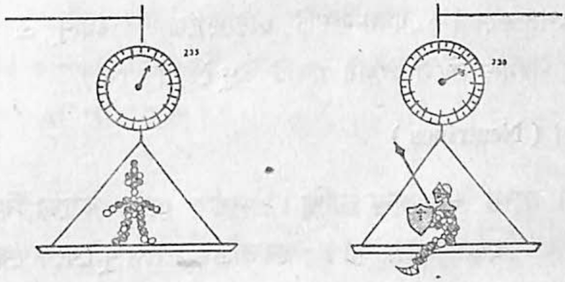


১ প্রোটন — ১ প্রোটন, ১ নিউট্রন

আয়ন (Ion)

একটি পারমাণবিক কণিকা, পরমাণু বা একটি অণুর যদি বিদ্যুৎ-আধান থাকে তবে তাকে আয়ন বলা হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়—একটি অক্সিজেন পরমাণুর কোনো বিদ্যুৎ-আধান নেই। কিন্তু কোনো ধাবমান বুলেট যদি ধাক্কা দিয়ে তার কোনো একটি ইলেকট্রন সরিয়ে দেয়, তাহলে অক্সিজেন পরমাণুটি পজিটিভ (ধন) তড়িৎ-আধানযুক্ত হয়ে পড়বে। বিকিরণের দ্বারা বাতাসের আয়নের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে ইলেক্ট্রোস্কোপ ব্যবহৃত হয়।

আইসোটোপ (Isotopes)



কোনো একটা মৌলিক পদার্থের যে-সব পরমাণু একই ওজনের, সেগুলি হলো সেই মৌলিক পদার্থটির আইসোটোপ। ইউরেনিয়াম —২৩৮ হলো ইউরেনিয়ামের একটা আইসোটোপ। ইউরেনিয়াম —২৩৫ হলো আর একটা আইসোটোপ। ২৩৮ এবং ২৩৫ সংখ্যা দুটি পারমাণবিক ওজন নির্দেশ করে। নিউট্রনের সংখ্যা কম-বেশি থাকে বলে ওজনেরও তারতম্য হয়।

মেসন (Mesons)

মেসন একরকম পারমাণবিক কণিকা। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের নিউট্রন ও প্রোটনগুলিকে একসঙ্গে ধরে রাখবার জন্যে এগুলি অতি প্রয়োজনীয়। পরমাণুর নিউক্লিয়াস যখন ভেঙে যায়, সেই শক্তি তখন সময় সময় একটি মেসন সৃষ্টি করে। কেমন করে মেসন নিউক্লিয়াসকে একত্রে জুড়ে রাখে, সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারলে বিজ্ঞানীরা হয়তো ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়াম ছাড়াও অন্যান্য পরমাণুকেন্দ্রিক জ্বালানী উৎপাদনে সক্ষম হবেন।

অণু (Molecule)

দুটি বা আরও বেশি পরমাণু একত্রিত হয়ে কোনো পদার্থের একক

মাত্রা তৈরি করে—এটা আমরা সচরাচর দেখে থাকি। ৯৬টি পরিচিত মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি বিভিন্ন রকমে একত্রিত হয়ে প্রত্যেকটি পদার্থ উৎপন্ন করে। যেমন—তুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে জলের একটি অণু তৈরি করে।

নিউট্রিনো (Neutrinos)

নিউট্রিনো হলো ওজনশূন্য রশ্মি। দৃশ্যত এরা কোনো কিছুর সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটায় না। তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে যেমন বিটা রশ্মি নির্গত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই সেরূপ নিউট্রিনোও নির্গত হয়।

নিউট্রন (Neutrons)

নিউক্লিয়াস বা পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু যে তুই রকমের মৌলিক কণিকার দ্বারা গঠিত, তাদের একটি হচ্ছে নিউট্রন। বিভাজনরত পরমাণু থেকে যেসব বুলেট ছিটকে বেরোয়, সেগুলি হচ্ছে নিউট্রন। নিউট্রনই হলো উৎকৃষ্ট বুলেট ; কারণ, তাদের কোনো বিত্যুৎ-আধান নেই। বিত্যুতাবিষ্ট কণিকা অতিক্রম করবার সময় তারা পথভ্রষ্ট হয় না। তাদের ওজন প্রোটনের ওজনের সমান। নিউট্রন অনায়াসে মানুষের শরীর ভেদ করে যেতে পারে এবং বেশি পরিমাণে গেলে বিপজ্জনক হতে পারে।

নিউক্লিয়ার (পরমাণুকেন্দ্রিক)

পরমাণুর কেন্দ্র সম্বন্ধীয়। পারমাণুকেন্দ্রিক বিজ্ঞান অর্থাৎ নিউক্লিয়াস সম্পর্কিত বিজ্ঞান হলো, পরমাণু কেন্দ্র সম্পর্কিত অনুশীলন। 'নিউক্লিয়ার ফিসন' হলো, পরমাণু কেন্দ্রের বিভাজন। নিউক্লিয়ার এনার্জি হলো, পরমাণুকেন্দ্র বিভাজিত হবার সময় যে শক্তি নির্গত হয়।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর

পারমাণবিক চুল্লীর অপর এক নাম।

নিউক্লিয়াস (কেন্দ্রক)

পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু। প্রচণ্ড শক্তির বলে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার দ্বারা এটি গঠিত। পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিভাজিত হবার সময় এই শক্তি মুক্ত হয়।

প্রোটন

পরমাণুর কেন্দ্র যে সব মৌলিক কণিকার দ্বারা গঠিত, তাদেরই একটি হলো প্রোটন। প্রোটন পজিটিভ (ধন) তড়িতাধান যুক্ত। পরমাণু বহির্কক্ষে যে-সব ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন থাকে (প্রত্যেকটি প্রোটনের জন্যে একটি করে ইলেকট্রন থাকে), সেগুলি নেগেটিভ (ঋণ) তড়িতাধানযুক্ত। এরা প্রোটনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং এই আকর্ষণই সেগুলিকে শূন্যে ছিটকে বেরিয়ে যেতে দেয় না।

প্লুটোনিয়াম



৯৪টি প্রোটন সমন্বিত নতুন একপ্রকার মৌলিক পদার্থ। ডঃ

সিবোর্গ এবং তাঁর সহকর্মীরা প্লুটোনিয়াম আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের পর প্রকৃতিতে অতি সামান্য মাত্রায় এই পদার্থের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ইউরেনিয়ামে আছে ৯২টি প্রোটন। সহজে বিভাজিত হয় না, এরূপ ইউরেনিয়াম পরমাণুকে (ইউ-২৩৮) যখন ছিটকে-আসা নিউট্রন-বুলেটের দ্বারা আঘাত করা হয়, তখন সেই নিউট্রন ইউরেনিয়াম পরমাণুর দ্বারা শোষিত হয়ে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই নিউট্রন একটি প্রোটনে পরিবর্তিত হয়। তখন ঐ পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা হয় ৯৩ এবং সে আর তখন মোটেই ইউরেনিয়াম থাকে না—সেটা হয় নেপচুনিয়াম। তারপর, কয়েকদিনের মধ্যেই আর একটা নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয় এবং তখন পরমাণুর প্রোটন-সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৪-তে। তখন হয় সেটা প্লুটোনিয়াম। এই অবিষ্কারের গুরুত্ব হলো এই যে প্লুটোনিয়াম পরমাণু ইউ-২৩৫-এর মতো, সহজেই বিভাজিত হয়। এবং ইউ-২৩৮ থেকে ইউ-২৩৫ পৃথক করা যেরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ইউরনিয়াম থেকে প্লুটোনিয়াম নিষ্কাশন তার চেয়ে অনেক সহজ।

তেজস্ক্রিয় (রেডিও-অ্যাক্টিভ)

যে-সব পরমাণু থেকে রশ্মি নির্গত হয়, সেগুলি হলো তেজস্ক্রিয়। প্রকৃতির রাজ্যের অল্প কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে রেডিয়াম হলো একটি। ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙে যাবার পর ক্ষুদ্রতর যে সব পরমাণু পুনর্গঠিত হয়, সেগুলিও তেজস্ক্রিয়। কোনো পদার্থের কিছুটা পারমাণবিক চুল্লীর মধ্যে রেখে ছিটকে-আসা নিউট্রন-বুলেটের দ্বারা আঘাত করতে পারলে প্রায় যে কোনো পদার্থকেই তেজস্ক্রিয় করা যায়। সময় সময় এই শব্দটাকে আরও সহজ করে 'রেডিও' বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—তেজস্ক্রিয় কার্বনকে বলা হয় রেডিও-কার্বন। তেজস্ক্রিয় পরমাণু বিকিরণরূপে তাদের কিছুটা অংশ ত্যাগ করে, তারপর অন্য পদার্থে পরিবর্তিত হয়। তেজস্ক্রিয় পরমাণুকে 'অস্থির' পরমাণুও বলা হয়।

রশ্মি

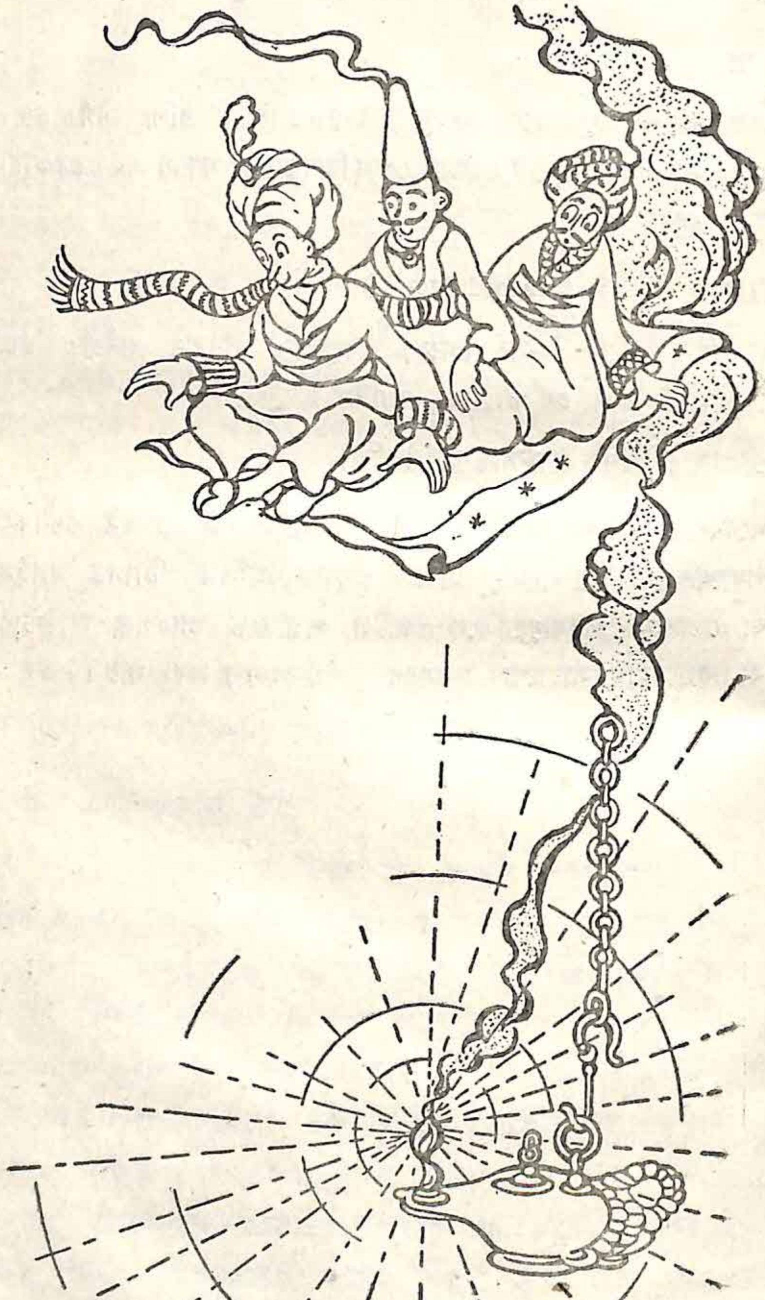
তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে আল্ফা, বিটা ও গামা রশ্মি নির্গত হয়। এদের মধ্যে গামা রশ্মিই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক, কারণ এর ভেদকারী শক্তি খুব বেশি।

ট্যাগ্ড্ অ্যাটম (**Tagged Atoms**)

গবেষণার কাজে যে-সব চিহ্নিত তেজস্ক্রিয় পরমাণু ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে বলা হয় 'ট্যাগ্ড্ অ্যাটম'।

ট্রেসার টেকনিক ('ট্রেসার কর্মপদ্ধতি')

গবেষণার কাজের জন্যে সাধারণ পরমাণুর সঙ্গে একই মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় পরমাণু মিশ্রিত করবার পদ্ধতি। 'ট্যাগড্ অ্যাটম' বা তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলিকে জটিল পদ্ধতিতে 'গাইগার কাউন্টার' বা ক্যামেরার সাহায্যে অনুসরণ (পর্যবেক্ষণ) করা যায়।



আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন

জেনেভা, ৮ই অগাস্ট—'আগামী ৪০ বৎসরের মধ্যেই হাইড্রোজেন বোমার অপ্রমেয় শক্তিকে সংহত করিয়া মানবজাতির শক্তি, তেজ ও বিদ্যুতের চাহিদা চিরকালের জন্য মেটান সম্ভব হইবে' বলিয়া আজ এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আরম্ভ দিবসে (পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন) ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

এই সম্মেলনে ৭৩টি দেশ হইতে প্রায় বারো শত বিজ্ঞানী সমবেত হইয়াছেন। পারমাণবিক শক্তিকে মানবজাতির শান্তিপ্রিয় সেবকরূপে ব্যবহারের উপায় নির্ধারণই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ হোমি জে. ভাবা সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে তাঁহার অভিভাষণে মানবজাতির সমক্ষে নূতন "আণবিক" সুবর্ণ যুগের প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেন।

ডাঃ ভাবা ঘোষণা করেন যে, আজ বিশ্ব ইতিহাসের যে অধ্যায়ে পদার্পণে [য] উদ্যত হইয়াছে, একদিন হয়তো সে অধ্যায়কে "আণবিক" যুগের আদিম অধ্যায় বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

তিনি বলেন, হাইড্রোজেন বোমার বিভাজন প্রক্রিয়া দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার মতো কোনও মৌলিক বৈজ্ঞানিক তথ্য আমাদের জানা নাই। এই জন্যই আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে ভরসা পাইতেছি যে, আগামী দুই দশকের মধ্যেই এইভাবে পারমাণবিক শক্তিকে মুক্ত করিবার একটা পদ্ধতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। উহা সম্ভব হইলে মানুষের বিদ্যুৎ ও শক্তি সংগ্রহের সমস্যা চিরতরে মীমাংসিত হইয়া যাইবে। কারণ শক্তি উৎপাদনের জন্য যে জ্বালানী দ্রব্যের

প্রয়োজন হয়, তাহা তখন সমুদ্রবক্ষে সঞ্চিত অপরিমিত হাইড্রোজেনের মতই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

ডাঃ ভাবা বলেন যে, পারমাণবিক যুগে বড় রকমের যুদ্ধ অসম্ভব হইয়া উঠিবে এবং সমগ্র বিশ্ব শান্তিপূর্ণ অবস্থিতির ক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

মানব-সভ্যতাকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে শক্তির নূতন উৎস খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। কারণ মানুষ পৃথিবীর বুকে সঞ্চিত জ্বালানী দ্রব্য প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে হারে জ্বালানী দ্রব্য খরচ হইয়া থাকে এবং আগামী একশত বৎসরে বিশ্বের জনসংখ্যা যদি দ্বিগুণিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর বুকে সঞ্চিত জ্বালানী দ্রব্য এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে।

মানুষ শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে (অর্থাৎ বাহিরের কোনও শক্তির সাহায্য না লইয়া) আট ঘণ্টা খাটিয়া যাহা উৎপাদন করিতে পারে তদ্দারা সে বড় জোর কোনও রকমে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

শিল্পের জন্য আবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে অধিকাংশই চাহিদা অনুযায়ী পাওয়া যাইবে ধরিয়া লইয়া শিল্পায়নের কার্য এ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা আর না-ও চলিতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিল্পে ব্যবহৃত বহু ধাতু বর্তমান ব্যবহারের হারে কয়েক দশকেরই মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। পৃথিবীর বক্ষে সঞ্চিত তৈল, কয়লা, গ্যাস প্রভৃতির ভাণ্ডার এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে ফুরাইয়া যাইবে।

এই সমস্যার সমাধানে মানুষ এখনও পারমাণবিক শক্তির প্রতি দৃষ্টি দিয়াছে। এই সম্মেলনে পৃথিবীর বুকে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম কী পরিমাণে সঞ্চিত আছে, তৎসম্পর্কে আলোচনা হইবে। অনুমান করা হইয়াছে ৫৬,০০,০০,০০ ০০,০০,০০,০০,০০ টন কয়লা পোড়াইয়া যে শক্তি পাওয়া যাইতে পারে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের জনিত সঞ্চয়

হইতে তাহা পাওয়া যাইবে।

বিশ্বে ব্যাপকভাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন শিল্প স্থাপন করিতে হইলে একটা আন্তর্জাতিক পরিষদ গঠন এবং বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিগুলির শান্তি রক্ষায় প্রস্তুত থাকা দরকার।

বৈজ্ঞানিকদের প্রথম কর্তব্য হইতেছে, সত্য উদ্ঘাটন করা এবং এই কার্যে মানবজাতির প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব রাষ্ট্রবিশেষের প্রতি আনুগত্য অপেক্ষাও বড়।

উপসংহারে ডাঃ ভাবা এই আশা ব্যক্ত করেন যে, পারমাণবিক যুগ যে পূর্ণতর জীবনের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে তাহার পরিপূরণে এই সম্মেলন সাহায্য করিবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারশীল্ড তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমিত হইবে। তিনি মন্তব্য করেন যে, এই সম্মেলন সম্পূর্ণরূপে অ-রাজনৈতিক সম্মেলন হইলেও ইহার সিদ্ধান্তগুলির রাজনৈতিক তাৎপর্য খুবই গভীর। এই সম্মেলনে এই কথাই প্রতিপন্ন হইবে যে, বিজ্ঞানীদের চিন্তাগত সহযোগিতা ব্যতীত মানব-সভ্যতার প্রগতি ব্যাহত হইবে। তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, এই সম্মেলনে বিজ্ঞানীদের আলোচনার ধারায় মানুষের মন যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির চিন্তাতেই অধিকতর নিবিষ্ট হইবে।

সম্মেলন উপলক্ষে এখানে ২টি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। একটি অনুষ্ঠিত হইতেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিজস্ব ভবনে এবং অপরটি জেনেভা শহরে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ভবনে যে প্রদর্শনী হইতেছে, তাহাতে বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যোগদান করিয়াছে। শহরে যে প্রদর্শনী হইতেছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে পারমাণবিক বাণিজ্য মেলা। এই মেলায় রাশিয়া ছাড়া বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ যোগ দিয়াছে।

সম্মেলন ১২ দিন ধরিয়া চলিবে। পারমাণবিক শক্তির বিভিন্ন

দিক সম্পর্কে সমবেত বিজ্ঞানীরা প্রবন্ধাদি পাঠ করিবেন।

এই অধিবেশনে দুজন বৃটিশ বিজ্ঞানী কর্তৃক লিখিত এক যুক্ত প্রবন্ধে এই মর্মে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয় যে, শক্তির নূতন একটা উৎস খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে, ভবিষ্যতে বিশ্ববাসীকে জ্বালানী দ্রব্যের অভাবজনিত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।

প্যালেস অব নেশন্সের বিরাট সম্মেলনকক্ষে শান্তির কাজে পারমাণবিক শক্তি নিয়োগ সম্পর্কে পৃথিবীর প্রথম সম্মেলনে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে সমাগত বিজ্ঞানী, পর্যবেক্ষক, আলোকচিত্র শিল্পী, দূরবীক্ষণ-যন্ত্রী [দূরদর্শন] ও সাংবাদিকে সম্মেলনে কক্ষ ভরিয়া গিয়াছিল। কয়েকদিন পূর্বে এখানে যে চারি প্রধানের সম্মেলন হয় তাঁহাদের প্রেরিত বাণী শুনিবার জন্য দেড় হাজারের অধিক লোক এই কক্ষের মধ্যে সমবেত হইয়াছিল।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার অ্যান্টনী ইডেন তাঁহার বাণীতে এই সম্মেলনকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য বিশ্বসহযোগিতায় চমৎকার উদাহরণ বলিয়া বর্ণনা করেন। পারমাণবিক শক্তি শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের পক্ষে এই সম্মেলনের ফলে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ হোমি ভাবা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশীল্ড ও সুইস প্রেসিডেন্ট মিঃ পেটিট পিয়েরের সহিত মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করেন।

গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ এই সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৭২টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেরিত বাণীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের আগ্রহের ফলে শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের যে পরিকল্পনা আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে তৎসম্পর্কিত এই সম্মেলনে আমি আমার শুভেচ্ছা জানাইতেছি। সম্প্রতি জেনেভায় যে চতুঃশক্তি সম্মেলন হইয়া

গেল তাহাতে, অকস্মাৎ পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার আতঙ্কের সম্মুখীন, রণক্লান্ত পৃথিবীর পক্ষে একটা আশার আলো দেখা দিয়াছে। আমি আশা করি, এখন এই সম্মেলন—মানুষের করায়ত্ত এই বিপুল শক্তির অপপ্রয়োগের বিপদ সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং শান্তিপূর্ণ প্রগতি ও সহযোগিতার পথ দেখাইবে।

এই সম্মেলনটি নূতন ধরনের—সাধারণত যে সব সম্মেলন হয় সেগুলি হইতে ভিন্ন। কারণ ইহা আমাদের পারমাণবিক যুগের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিতেছে। আমাদের এই নূতন যুগের সহিত মানাইয়া চলিতে এবং ধ্বংসের বদলে শান্তির দিক হইতে চিন্তা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে জেনেভায় সমবেত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের ও অন্যান্য সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন পারমাণবিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রগতির সূচনা করিল। যুদ্ধের জন্য নহে, মানবকল্যাণের জন্য এই যুগের এই বিরাট আবিষ্কার সম্পর্কে সহযোগিতার যুগ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার বাণীতে বলিয়াছেন যে, বিশ্বের পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের নিকট যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিশ্রুতি দিতেছে যে, এই বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষের বিনাশের জন্য নহে, তাহার কল্যাণের জন্যই উৎসর্গ করা হইবে। তিনি এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শুভেচ্ছা ও সাফল্য কামনা করেন।'

জুলাই, ১৯৫৫

শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের উপায়

শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের উপায় সম্বন্ধে ডাঃ পিটার সাইক্স্ লিখিয়াছেন ঃ

পারমাণবিক কিংবা নিউক্লিয়ার শব্দটি শুনিলেই আমাদের বোমার কথা মনে হয়। কিন্তু নিউক্লিয়ার শক্তির আর একটা দিকও আছে যাহা আমাদের ক্ষতির পরিবর্তে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে।

বিস্ফোরণের ফলে পারমাণবিক বোমা হইতে নির্গত হয় প্রচণ্ড শক্তি। এই শক্তি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে বহু বৎসর ধরিয়া তাহাকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভব। সেই জন্য নির্গত শক্তিকে এক মুহূর্তে বিরাট বিস্ফোরণের মধ্য দিয়া নিঃশেষিত হইতে না দিয়া ধীরে ধীরে নির্গমনের পথ দিবার চেষ্টা হইতেছে। এই ধীরে ধীরে নির্গমনের পথ দিবার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে পারমাণবিক পাইল বা পারমাণবিক চুল্লীতে।

এই ধরনের নূতন শক্তির উৎস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ শক্তি সরবরাহের জন্য আমরা প্রধানত নির্ভর করিতেছি কয়লা এবং তৈলের উপর ; কিন্তু ইহার কোনটিই চিরকালের জন্য লভ্য নয়, বিশেষত প্রতি বৎসর যখন কয়লা ও তৈলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। পাইলে যে ইন্ধন ব্যবহৃত হইতেছে (এই পাইলগুলিই হইল সত্যকারের নিউ-ক্লিয়ার ফার্নেস) প্রধানত তাহা হইল ভারী ইউরেনিয়াম ধাতু। সৌভাগ্য-বশত এই ধাতু এখনও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অবশ্য ক্যানাডার উত্তরে যে ধরনের বিরাট খনি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দুর্লভ।

পারমাণবিক ইন্ধন ব্যবহৃত হইতে থাকিলে প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ ব্যবহৃত হইতে পারে জলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করিবার জন্য। এই বাষ্পের টার্বাইন চালাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। সাধারণত এই ভাবে নিউক্লিয়ার শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করাই সুবিধাজনক ; কারণ বিদ্যুৎই সহজ পরিবর্তনশীল শক্তির উৎস। ইহা সর্বপ্রকার কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং ইহা শত শত মাইল-ব্যাপী অঞ্চলের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হইতে পারে।

পারমাণবিক ইন্ধন ব্যবহারের একটি প্রধান সুবিধা হইল এই যে, ইহা অত্যন্ত ঘনীভূত। এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ামের সমান হইল বিপুল

পরিমাণ কয়লা। সেই জন্য সামান্য ইউরেনিয়ামের সাহায্যে অনেকখানি কাজ করাইয়া লওয়া সম্ভব! উপরন্তু পারমাণবিক ইন্ধনের কিছুটা অংশ পারমাণবিক চুল্লীতে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়া যায় না—তাহা অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া পুনরায় ইন্ধন রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে একটা বড় রকমের অসুবিধা অতিক্রম করিবার প্রয়োজন হয়। এই অসুবিধা হইল এই যে, চুল্লী যে বিপজ্জনক রশ্মি বিচ্ছুরণ করে তাহা কর্মে নিযুক্ত লোকজনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ইহার একমাত্র প্রতিকার হইল চুল্লীর চতুর্দিক পুরু কংক্রিটের দেওয়াল এবং অন্যান্য প্রতিরোধক বস্তু দিয়া ঘিরিয়া রাখা, যাহাতে এই ভয়াবহ রশ্মি বাহির হইয়া আসিতে না পারে এবং সেই সঙ্গে কারখানার সর্বাংশে নানা ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত কাজই বৃটেনে অনেকটা নিরাপদে সম্পন্ন হইতেছে।

নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে যেমন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইতেছে তেমনই জাহাজ চালনার জন্যও নিউক্লিয়ার ইঞ্জিন নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে। অনেকেই হয়তো নিউক্লিয়ার শক্তির সাহায্যে চালিত সাব-মেরিনের কথা শুনিয়াছেন। বিমানের জন্যও ইতিমধ্যে এই ধরনের ইঞ্জিন নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। এই ব্যাপারেও প্রধান অসুবিধা হইল, বিপজ্জনক রশ্মি বিকিরণের হাত হইতে জাহাজ বা বিমানের কর্মীদের রক্ষার ব্যবস্থা করা।

এই কারণেই নিউক্লিয়ার শক্তিচালিত মোটর গাড়ি এবং বাইসাইকল্ নির্মাণের প্রশ্ন এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কারণ এই ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকারের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিন নির্মাণ সম্ভব হলেও বিপদের হাত হইতে চালককে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা সহজসাধ্য নয়।

আশাতীতরূপেই আমরা পারমাণবিক পাইল হইতে লাভবান হইয়াছি। চালু পাইলের মধ্যে কোনো কোনো পদার্থ স্থাপন করা হইলে

দেখা যায়, সেই সকল পদার্থের ধর্ম পরিবর্তিত হইয়াছে। পাইল হইতে সরাইয়া আনিবার পর তাহাদের পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এই সকল পদার্থ নানা ধরনের রশ্মি বিকিরণ করিতেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, তেজস্ক্রিয়তাই ইহার কারণ।

এই ধরণের তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি সম্পর্কে একটা সুবিধার বিষয় হইল এই যে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রের সাহায্যে ইহার ক্ষুদ্রতম পরিমাণও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। এই তেজস্ক্রিয় বা সন্ধানী পদার্থগুলি নানা কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। রোগীর দেহের কোনো অংশে রক্ত চলাচল ধীর গতিতে হইতেছে, না বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা জানিবার জন্য এই পদার্থগুলির ব্যবহার সম্ভব। পুড়িবার ফলে উৎপন্ন ক্ষতস্থানে নূতন চামড়া বসাইবার পর রক্ত সরবরাহ শুরু হইয়াছে কিনা, ইহার সাহায্যে তাহাও জানা যায়। মোটের উপর এই কথা সত্য যে, শান্তিপূর্ণ কাজে নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়োগের যে প্রচেষ্টা আজ দেখা দিয়াছে তাহা বর্তমান শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়।

ডিসেম্বর, ১৯৫৫

সিন্‌ক্রোট্রন

পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান, পরমাণুর অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তির কথা বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই জানতেন। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে মাত্র অল্প কিছুকাল পূর্বে তাঁরা সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে পেরেছেন। অ্যাটম বোমাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতদিনের সাধনার ফলে মানুষ আজ পরমাণু জগতে প্রবেশ করেছে। অবশ্য এই প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে তারা ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে না পারলে কেবল ধ্বংসকার্যে ব্যবহার

করেই শক্তি আহরণের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবে না। তাই আজ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এই শক্তিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করবার জন্যে ব্যাপকভাবে চেষ্টা চলছে। সকলেই জানেন পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ যাকে আমরা পরমাণু বলি, সেগুলো ইলেকট্রন প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কতকগুলো মৌলিক কণিকার সমবায়ে গঠিত। যেমন ইউরেনিয়াম একটা মৌলিক পদার্থ। ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর পরমাণুর বাইরের দিকে আছে ৯২টা ইলেকট্রন আর এর ভিতরের কেন্দ্রীয়বস্তু অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা ৯২টা প্রোটন এবং ১৪৩টা নিউট্রন কণিকার সমবায়ে গঠিত। এই কণিকাগুলোর মতো ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ে মারতে পারলে পরমাণুকে ভেঙে ফেলা যেতে পারে, অবশ্য ঢিল যদি ঠিক মতো জায়গায় আঘাত করে। পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থটাকে ভেঙে ফেলতে পারলে পদার্থের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। পরমাণুর উপাদান বিভিন্ন কণিকাগুলোকে ঢিল বা বুলেটের মতো ব্যবহার করে পরমাণু ভাঙবার ব্যবস্থা অনেকদিন ধরেই চলছিল। এরূপ সাধারণ ঢিল ছোঁড়ার ব্যবস্থায় ইলেকট্রনগুলোকে পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন ব্যাপার নয়; কিন্তু পরমাণুর ভিতরকার কেন্দ্রীয়বস্তু অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটাকে ভাঙাই শক্ত। পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তুটাকে ভাঙতে না পারলে পদার্থের রূপান্তর ঘটে না এবং ভিতরকার সংহত শক্তিকেও বা'র করা চলে না। যেসব মৌলিক কণাগুলোকে বুলেটের মতো ব্যবহার করা হয় তাদের গতিবেগ অসম্ভবরূপে বাড়িয়ে তুলতে পারলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টাই হয়েছে। সর্বশেষে ডাঃ লরেন্স বহুদিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সাইক্লোট্রন নামে অদ্ভুত এক বিরাট যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

একটা ঢিল হাতে করে যত জোরে ছোঁড়া যায়—লম্বা একটা দড়ির প্রান্তে বেঁধে ঢিলটাকে কিছুক্ষণ ঘোরাবার মুখে হঠাৎ ছেড়ে দিলে বেশি শক্তি অর্জনের ফলে তার গতিবেগ অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। দড়ি বাঁধা ঢিলের মতো না হলেও কতকটা ওই ধরণে, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির সহায়তায় সাইক্লোট্রন, বুলেটরূপে ব্যবহৃত কণাগুলোর গতিবেগ

অসম্ভবরূপে বাড়িয়ে তোলে। ঠিক তাগ্ মাফিক লাগাতে পারলে এই বেগবান কণাগুলো যে কোনো পদার্থের পরমাণুকে আঘাত করে ভেঙে ফেলতে পারে। সাইক্লোট্রনের সাহায্যে প্রোটন, ডয়টারন প্রভৃতি ধন-তড়িতাবিষ্ট কণাগুলো বিশ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের মতো শক্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু এই কণাগুলোর বস্তুপরিমাণ বা ভর অনেক বেশি, কাজেই গতিবেগ খুব বেশি বাড়ে না। এজন্যেই বিজ্ঞানীরা এরূপ বুলেটের গতি আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে নতুন উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। ফলে, অনেকদিন থেকেই বিটাট্রন যন্ত্র তৈরির কথা তাঁদের মনে উদিত হয়েছিল। অবশেষে ডাঃ ওয়াল্টন্ বিটাট্রন তৈরি করবার কার্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ১৯৪৩ সালে ইলিনয়েসের প্রোফেসর কার্স্টের উদ্যোগে ১০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের বিটাট্রন যন্ত্রের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালে প্রোফেসর কার্স্ট ২৫০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের আর একটি বিটাট্রন নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। পরে জানা গেছে, জার্মান বিজ্ঞানীরা নাকি তার আগেই বিটাট্রনের সাহায্যে বিভিন্ন রকমের আণবিক গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন। সাইক্লোট্রনে যেমন ধন-তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলোর গতিবেগ বৃদ্ধি করা হয়, বিটাট্রনে সেরূপ ঋণ-তড়িতাবিষ্ট বিটাকণিকা অর্থাৎ ইলেকট্রনের গতিবেগ বাড়িয়ে তোলা হয়।

এক ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন বিটা-কণিকা সেকেণ্ডে ৩৭০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। ১০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন কণিকাগুলো সেকেণ্ডে প্রায় ৩৭০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে। ভোল্টেজ আরও বাড়িয়ে দিলে গতিবেগ কিন্তু ঐ অনুপাতে অসম্ভব রূপে বাড়ে না, তবে ক্রমশ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি যেতে পারে। আলোর গতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। মিলিয়ন ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের শতকরা ৯৫ ভাগ অর্জন করতে পারে। কারণ অধিকতর শক্তি বৃদ্ধিতে ইলেকট্রন কণিকা-গুলোর গতিবেগের কাছাকাছি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের 'মাস্' অর্থাৎ

ভর বেড়ে যায়। আগেই বলেছি সাইক্লোট্রনে ধন তড়িতাবিষ্ট কণিকার গতিবেগ বাড়িয়ে তোলা হয়। কিন্তু এই কণিকাগুলোর ভর বেশি বলে ২০,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি প্রয়োগেও গতিবেগ বেশি বাড়তে পারে না।

কাজেই ইলেকট্রন বুলেটগুলোর গতিবেগ আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে বিজ্ঞানীরা এক নতুন রকমের যন্ত্র তৈরী করবার পরিকল্পনা করেন। এই যন্ত্রের নাম সিনক্রোট্রন। বিভাট্রন এবং সাইক্লোট্রন, এই উভয় যন্ত্রের মূলসূত্রের সমন্বয়ে মিচিগান ইউনিভার্সিটিতে এরূপ একটা বিরাট যন্ত্র তৈরী হয়েছে। নির্মাণ পরিকল্পনাকারী বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'রেস্‌ট্র্যাক'।

এই যন্ত্র সাহায্যে বিটা-কণিকা অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলোকে তিনশ' মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং তাদের গতিবেগ বাড়বে প্রায় আলোর গতিবেগের কাছাকাছি। মোটের উপর এগুলো হবে অপেক্ষাকৃত মৃদুগতি সম্পন্ন ব্যোম-রশ্মির মতো। এরূপ প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন বুলেটের আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তু তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হবেই অধিকন্তু পরমাণুর উপাদান, মৌলিক কণিকাগুলোও হয়তো রেহাই পাবে না। যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায়, বিটাট্রনের সাহায্যে মেসন নামক মৌলিক কণিকার উৎপাদন, তামাকে নিকেলে আর রূপাকে ক্যাডমিয়াম এবং প্যালাডিয়ামে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এখন সিন্‌ক্রোট্রন যে আরও কত কি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবে তা' জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন।

ডিসেম্বর, ১৯৪৮

বিভাট্রন

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরমাণু চূর্ণ করবার জন্য বিভাট্রন নামে একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে। পরমাণুর গঠনপ্রণালী এবং এ পর্যন্ত পরমাণুর আভ্যন্তরীণ অবস্থা যা জানা যায়নি, তা জানবার পথ এই যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে আরও প্রশস্ততর হয়েছে।

জড় জগতের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশের দরজা এতকাল ছিল রুদ্ধ। আজ এই অভিনব যন্ত্রটি জড় পরমাণুর অন্তরতম দেশে পৌঁছোবার সন্ধান দিয়েছে। পরমাণু বিভাজনের এইটিই হলো বৃহত্তম ও সর্বাধিক শক্তিশালী যন্ত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের অর্থানুকূল্যেই যন্ত্রটি নির্মিত হয়েছে। এই কমিশনকে কল্যাণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তির উন্নতি সাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মানুষের জ্ঞান প্রসারে এই যন্ত্রটি যে অপরিসীম সাহায্য করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ভবিষ্যতে পরমাণুকে আরও নতুন নতুন কল্যাণকর কার্যে কিভাবে নিয়োগ করা যাবে, এই যন্ত্রের সাহায্যেই হয়তো তারও সন্ধান পাওয়া যাবে।

এই যন্ত্র যে শক্তি উৎপাদন করে তা বিলিয়ন্‌স্ অব ইলেকট্রন ভোল্ট দিয়ে পরিমাপ করা হয় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে বিভাট্রন। (১০০ কোটি ইলেকট্রন ভোল্টে ১ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট ; ইহাই শক্তির মানের একক)। ৬,২৫০, ০০০, ০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকণা প্রোটনের গতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভাট্রন পরিকল্পিত হয়েছে।

পরমাণু বিভাজনের অন্য কোনো যন্ত্র দ্বারা আজও এই পরিমাণ শক্তি উৎপাদন সম্ভব হয় নি। লং-আইল্যাণ্ডের ব্রুকহ্যাভেনের পারমাণবিক

শক্তি কমিশনের গবেষনাগারে কস্‌মোট্রন নামে পরমাণু বিভাজনের যে যন্ত্রটি আছে তা দিয়ে মাত্র ২,৩০০, ০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপাদিত হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে রঞ্জনরশ্মি ও তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের ফলে পদার্থ বিজ্ঞানে বিপ্লব দেখা দেয় এবং পরমাণুর গঠন প্রণালী পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়। এক সময়ে পরমাণুকে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ বলে মনে করা হতো। কিন্তু আধুনিক আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল, তার গঠনপ্রণালী বেশ জটিল।

বিজ্ঞানীরা প্রথম যখন পরমাণু বিভাজনের প্রয়াস পান তখন তাঁরা পরমাণুর উপাদানের মধ্যে তিনটি মাত্র মৌলিক কণিকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন; যেমন—প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন। পরবর্তীকালে পরমাণু বিভাজনের উদ্দেশ্যে আরও শক্তিশালী যন্ত্র নির্মিত হয় এবং তাদের সাহায্যে আরও মৌলিক কণিকা আবিষ্কৃত হয়, আজ বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর মধ্যে ঐ প্রকার অনেকগুলি মৌলিক কণিকার সন্ধান পেয়েছেন।

তবে তাঁরা এখনও আবিষ্কারের শেষ সীমায় এসে পৌছান নি। এসব কণিকার অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী, অনেকেরই অস্তিত্ব এক সেকেণ্ডেরও বহু লক্ষাংশ কম! ক্ষণিকের মধ্যেই এসব কণিকা নতুন কণিকায় রূপান্তরিত হয়। আবার সময়ে সময়ে একটি কণিকাকে দুই বা ততোধিক কণিকায় পরিণত হতে দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে পরমাণু যে কী কী অপরিবর্তনীয় মৌলিক কণিকা দিয়ে গঠিত তা এখনও নিরূপিত হয় নি। বিভাট্রনের সাহায্যে হয়তো এসব রহস্যের অন্তত কতকটা উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে। বিভাট্রন এবং পরমাণু বিভাজনকারী অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াস ভাঙা হয়। এর ফলে বিভক্ত অংশসমূহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা অথবা তাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করাও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কাজটি খুবই শক্ত! কারণ যে শক্তি পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ মৌলিক উপাদান-

গুলিকে একত্রিত করে রাখে, বর্তমানে তার চেয়ে বৃহত্তর শক্তির কথা কারো জানা নেই—মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চেয়েও তা বৃহত্তর।

প্রোটনগুলি ধনাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন। বিভাট্রনের সাহায্যে প্রোটনগুলিকে উচ্চ গতিসম্পন্ন করে পরমাণুর দিকে বুলেটের মতো ছুঁড়ে মারা হয়। কয়েক রকমের প্রক্রিয়ার সাহায্যে একাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

বিভাট্রনের মধ্যে একটি গোলাকার বৃহৎ চুম্বক আছে। এই চুম্বকের সাহায্যে প্রোটনগুলিকে একটি বিশেষ পথে পরিচালিত করা হয়। এই চুম্বকটিই হলো বিভাট্রনের প্রাণ। এরই জন্যে প্রোটনগুলি ১'৮৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ৪,০০০,০০০ বার ঘোরে, অথবা ৩০০,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে, অর্থাৎ এদের গতি প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি।

বিভাট্রনের এক্সিলারেটিং কক্ষের মধ্যে ধাবমান প্রোটনগুলি প্রায় ৬০০০,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপাদনে সক্ষম এবং এরাই মাঝামাঝি শক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মিতে পরিণত হয়।

এই উচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রোটনের সাহায্যে অন্যান্য পরমাণুর বিভাজন ঘটানো হয় এবং এরা নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন, নিউট্রন ও মেসন বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়েশন ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ডাঃ আর্নেস্ট ও-লরেন্স এই সম্পর্কে বলেছেন, পরমাণু থেকে শক্তি আহরণে বিজ্ঞান যদিও সফলকাম হয়েছে তথাপি পরমাণুর নিউক্লিয়াস যে শক্তি ও প্রক্রিয়ায় চালিত হয় তার স্বরূপ এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। তবে বিভাট্রন আবিষ্কারের ফলে নিউক্লিয়াসের স্বরূপ ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়েছে। নিউক্লিয়াসের মূল প্রকৃতি সম্পর্কেও আজ এই গবেষণার ফলে অনেক কিছু জানা গেছে।

তাছাড়া, প্রোটন ধনাত্মক বিদ্যুৎ পরিবাহী বস্তু, এর ঋণাত্মক বিদ্যুৎ পরিবাহী অপর বিপরীত অংশের সন্ধানও বিভাট্রনের সাহায্যে হয়তো একদিন পাওয়া সম্ভব হবে। বিভাট্রনের সাহায্যেই তখন প্রমাণিত

হবে, প্রোটন কোনো মৌলিক পদার্থ নয়।

এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার মেসন সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানা যাবে। মেসন অতি ক্ষণস্থায়ী পদার্থ এবং এত স্বল্পকাল স্থায়ী যে, এদের সম্পর্কে কোনো প্রকার পর্যালোচনা করা আজও সম্ভব হয় নি।

মৌলিক পদার্থকে বিভাট্রনের সাহায্যে কিভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে, সেকথা অবশ্য এখনও অনুমান করা যায় না; তবে ১৯৪৫ সালে বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী বোরিস প্রিগেল এই সম্ভাবনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শক্তিশালী তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে যে কোনো মৌলিক পদার্থকে আমরা হয়তো শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হব এবং এই শক্তি উৎপাদনের জন্যে তখন কেবল মাত্র ইউরেনিয়ামের মত দুষ্প্রাপ্য বস্তুর উপরই নির্ভরশীল থাকতে হবে না।

মার্চ, ১৯৫৫

মানব সেবায় আণবিক শক্তি

বৃটেনের বিজ্ঞানীরা আণবিক শক্তিকে মানব সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য যে বিরাট গবেষণামূলক কার্যে লিপ্ত আছেন তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় সম্প্রতি প্রকাশিত হারওয়েল নামক পুস্তকে।

হারওয়েলস্থিত আণবিক গবেষণা কেন্দ্রটি গত পাঁচ বৎসরব্যাপী যে মহামূল্যবান গবেষণাকার্য চালায় তাহার প্রথম সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হয় এই হারওয়েল নামক পুস্তকে।

ইহাতে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে বৃটিশ বিজ্ঞানীদের বিরাট প্রচেষ্টা কিভাবে মানব কল্যাণের পথে পরিচালিত হইয়াছে তাহা জানা যায়।

পুস্তকে বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে।

ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞানীরা এমন এক শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন যাহা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন বা জাহাজ চালাইবার কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে যে তাহা সম্ভব হইবে তাহার যথেষ্ট প্রমাণও ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া আণবিক শক্তি হইতে যে উপজাত পদার্থ লাভ করা গিয়াছে তাহা চিকিৎসক, কৃষিবিদ্, শিল্পপতি এবং গবেষণাকারীদের নূতন উপকরণের সন্ধান দিবে। হারওয়েলে এই উপজাত পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে এবং ২৬টি দেশের কল্যাণমূলক কাজে এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

এই পুস্তকটিতে ৩২টি আলোকচিত্র আছে এবং তাহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮। বৃটেন কী ভাবে ক্রমশ আণবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিতেছে তাহা ১৯৪৬ সাল হইতে তাহার কর্ম প্রচেষ্টার [এই] বিবরণীতে পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতকে আণবিক মতবাদের জনক জন ডাল্টনের সময় হইতে আণবিক শক্তি সম্পর্কে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা কাজ করিয়া আসিতেছেন—আণবিক বিজ্ঞানের এই বিবর্তন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে এ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কাজ আরম্ভ হয় এবং আমেরিকায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা সমবেতভাবে গবেষণাকার্য চালাইতে থাকেন। যুদ্ধের পর বৃটেনে এই কাজ নানা কারণে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নাগারের বাহিরে তাহার কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় না।

নূতন প্রচেষ্টা

বৃটেন তাহার পূর্বের সমস্ত কাজ সম্পর্কে ফল লাভের জন্য নূতন করিয়া চেষ্টা শুরু করে। এই চেষ্টার ফলেই স্থাপিত হয় আণবিক শক্তির

গবেষণা প্রতিষ্ঠান। স্যার জন কক্রফট্ ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং আণবিক শক্তির নূতন ক্ষেত্রে বৃটেনের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা নূতন উদ্যমে এখানে কাজ আরম্ভ করেন।

হারওয়েল পুস্তকটিতে গবেষণার দিকই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শেফিল্ডে দুইটি প্লুটোনিয়াম উৎপাদনকারী আণবিক পাইল—ইউরোপের বৃহত্তম পাইল-নির্মিত হইবার পূর্বে—যে গবেষণা চালাইতে হইবে তাহার বিবরণও কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে।

কার্যকরী শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে আণবিক শক্তির ব্যবহারের কথা পুস্তকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে, কার্যকরী শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা আজ আর অসম্ভব চিন্তা নয়, ইহা যে অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা হইল এই যে, এই ধরনের কার্যকরী শক্তি উৎপাদন অর্থব্যয়ের দিক দিয়া কী পর্যন্ত সহজ হইবে তাহা এখনই অনুমান করা চলে না।

যে উপজাত পদার্থগুলি ইতিমধ্যে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ্‌সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার উৎপাদন পরিমাণ ১৯৪৬ সালে হয় ১০০, কিন্তু ১৯৫১ সালে, এই পাঁচ বৎসরে, তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০,০০০। এই আইসোটোপ্‌স্ আজ মানুষের জীবন রক্ষা করিতেছে, শস্য এবং শ্রমশৈল্পিক উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করিতেছে। আরও যে সমস্ত কল্যাণমূলক কাজে তাহা ব্যবহৃত হইতেছে তাহার পরিচয়ও হারওয়েলে বর্ণিত হইয়াছে।

পুস্তকটি সাধারণ পাঠকদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। বিজ্ঞানী এবং ছাত্রেরাও ইহাতে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

জুলাই, ১৯৫২

শস্য উৎপাদনে রেডিও-আইসোটোপ

যুক্তরাজ্যে কৃষি-গবেষণার কার্যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মৃত্তিকা বা উদ্ভিদের মধ্যে এই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো ফল বিশেষভাবে লক্ষ্য না করা গেলেও আশা করা যাইতেছে যে, মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ কী পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে এবং কী পরিমাণ বিভিন্ন পদার্থ মৃত্তিকার মধ্যে চলাফেরা করে, আইসোটোপের সাহায্যে তাহা পরিমাপ করা সম্ভব হইবে।

বিভিন্ন ধরনের জমি এবং শস্য সম্পর্কে সার প্রয়োগ ব্যবস্থা ইহাতে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

কতিপয় গবেষণা কেন্দ্র উদ্ভিদের দেহতত্ত্ব, শস্য পুষ্টি এবং সার সম্পর্কিত নানা সমস্যা সম্বন্ধে পরীক্ষার সময় তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস ব্যবহার করিতেছে। সম্প্রতি রদামস্টেড পরীক্ষাকেন্দ্রেও আইসোটোপ ব্যবহৃত হইয়াছে। Wireworm নামক একপ্রকার উদ্ভিদ বিনষ্টকারী কীটের দমন সম্পর্কেও তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আইসোটোপের ব্যবহার ইতিমধ্যে ভেষজ এবং শ্রমশিল্পে ব্যাপক-ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। অপচয় নিবারণের জন্য মুদ্রণ এবং বস্ত্র শিল্পে ইহা বিশেষভাবে ফলপ্রদ হইয়াছে।

এই পদার্থগুলি কয়লাখনিতেও ব্যবহৃত হইতে পারে। এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইসোটোপ এক্স-রে'র স্থান গ্রহণ করিয়া ওয়েল্‌ডিং এবং কাস্টিং-এর মধ্যে ত্রুটি কোথায় তাহা দেখাইয়া দিতে হইয়াছে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের ক্ষেত্র যেমন ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে, বিশ্বব্যাপী চাহিদা তেমনই বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃটেনই বিশ্বের সর্বপ্রধান আইসোটোপ সরবরাহকারী দেশ—যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় তাহার সরবরাহ পরিমাণ দশ গুণের অধিক। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে আইসো-

টোপের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি বৃটিশ সরবরাহ মন্ত্রী-দপ্তর এবং শিকাগোর নিউক্লিয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তদনুযায়ী মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা সম্পর্কে এখন বৃটিশ তেজস্ক্রিয় যৌগিক পদার্থ ব্যবহার করিতে থাকিবেন।

নভেম্বর, ১৯৫২

কৃষি উন্নয়নে আণবিক শক্তি

ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ—যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিকার্যে আণবিক শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কিত গবেষণার ফলে যে সকল উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে তাহার দ্বারা বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথ সুগম হইবে বলিয়া কৃষিতত্ত্ববিদগণ অনুমান করিতেছেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার বিতর্ক সভায় মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ ইসাদর লুবিন উপরোক্ত তথ্য জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র শান্তির জন্য আণবিক শক্তি বিনিয়োগে ব্রতী হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা বিশ্বের কল্যাণই সাধিত হইবে।

মার্কিন কৃষি গবেষণা কার্যে সন্ধানী পরমাণু (Tracer Atom) ব্যবহারের ফলাফল সম্পর্কে মিঃ লুবিন মন্তব্য করেন। তিনি জানান যে, কৃষি উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সার প্রয়োগ করা এবং তাহার গুণাগুণ নির্ণয় করা ইহার সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। মিঃ লুবিন আরও বলেন, কৃষি বিজ্ঞানীরা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি উন্নয়নে আণবিক শক্তি প্রয়োগের পাঁচ বৎসরের মধ্যে যেরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে গত পাঁচশত বৎসরের মধ্যেও তাহা হয় নাই।

পরিশেষে মিঃ লুবিন খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদস্যগণকে উদ্দেশ্য করিয়া জানান যে, এই নবলব্ধ উন্নত কৃষি পদ্ধতি যাহাতে বিশ্বের অন্যান্য

দেশের কৃষি উন্নয়ন কার্যেও ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্ববিধ চেষ্টা করিবে।

জুলাই, ১৯৫২

ধাতুশিল্পে আণবিক শক্তির প্রয়োগ

অ্যাকাডেমিশিয়ান জি. বুর্দমফ লিখিয়াছেন, সুবিখ্যাত ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী জন বার্নাল পৃথিবীর সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞানীর চিন্তাধারা ও আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে, আণবিক যুগে মানুষ যদি টিকিয়া থাকিতে চায় তাহা হইলে পরস্পরের সহিত লড়াই করিয়া তাহা হইবে না, মানুষকে বাঁচিতে হইলে পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার দ্বারাই বাঁচিতে হইবে। বিজ্ঞান সেবক হিসাবে এই কথা তিনি আন্তরিকভাবে অনুভব করেন; কেন না, বর্তমান পরিস্থিতি বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যেরই অনিবার্য পরিণতি এবং তাঁহাদের গবেষণা যাহাতে মানবজাতির অমঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহাদিগকেই সচেষ্ট হইতে হইবে।

বিজ্ঞানের লক্ষ্যই হইল, মানুষের কল্যাণ সাধন করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা আণবিক শক্তি সম্পর্কিত গবেষণা কার্য পরিচালনা করিতেছেন।

আণবিক রিঅ্যাক্টর বা অ্যাক্সিলেটরে নিউট্রন সংঘাতে লব্ধ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এখন সাফল্যের সঙ্গে ধাতু শোধন শিল্পে প্রয়োগ করা হইতেছে। উপরোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত আইসোটোপ সস্তা ও সহজলভ্য। সুতরাং ধাতুশোধন, মেশিন তৈয়ারি, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে সোভিয়েট দেশে উহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

এই কথা সুবিদিত যে, চৌম্বক ডিটেক্টোস্কোপি ও এক্স-রে শ্রম শিল্পে প্রবর্তিত হইয়াছে বহুদিন আগেই। কাস্টিং ও ওয়েল্ডিং-এর

কাজের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণে এই পদ্ধতি অকেজো বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই চৌম্বক পদ্ধতির সাহায্যে অত্যধিক ঘনত্বের ইস্পাতের আভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিতে পারা যায় না। সকল ক্ষেত্রে এক্স-রে প্রয়োগ করাও সম্ভব নয়, কারণ অংশগুলি প্রায়ই এত ঘন বা পুরু থাকে যে, এক্স-রে কার্যকরী হয় না। ২০০ কিলোভোল্টের এক্স-রে সরঞ্জাম অনধিক ৬০ মিলিমিটার পুরু ইস্পাত এক্স-রে করিতে পারে; সাধারণত কেবল সামান্য ঘনত্বসম্পন্ন ধাতুর মধ্যেকার কুঞ্চন, গর্ত, চিড় ও অন্যান্য সব দোষ ত্রুটি ধরিতে সক্ষম। অবশ্য রেডিয়ামের বিচ্ছুরণও আছে; কিন্তু উহা অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ।

আণবিক শক্তির সদ্ব্যবহারের প্রশ্ন ধাতু গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমাদের পূর্ব ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট ব্যবহার করিয়া আমরা ৩০০ কিলোমিটার পুরু ইস্পাত ও ধাতব বস্তুর ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম। রেডিয়ামের তুলনায় এরূপ কোবাল্ট কয়েক হাজার গুণ সস্তা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রমশিল্পের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটাইতে যতখানি দরকার ততখানি তেজস্ক্রিয় কোবাল্টই আমরা পাইতে পারি।

সোভিয়েট দেশে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট ক্রমশ আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে। ইহার সাহায্যে ইঞ্জিনের বয়লারের গুণ, বাষ্প-চালিত যন্ত্রাদির সাজ-সরঞ্জাম, ব্লাস্ট ফার্নেসের ওয়েল্‌ডেড্ কেসিং ও সকল প্রকার কাস্টিং-এর খুঁটিনাটি সাফল্যের সহিত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তেজস্ক্রিয় নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।

আর একটি বিষয়ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাহা হইতেছে এই যে, কোবাল্ট সরঞ্জাম এক্স-রে সরঞ্জামের মতো জটিল নহে এবং তুলনায় অধিকতর কার্যকরী। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অতীব জটিল অনু-সন্ধানের কাজ পরিচালনা করা, যন্ত্রপাতি মাউন্টিং করা, কাজ চলিবার সময় সাজ-সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রিত করা, অর্থাৎ মেশিন বন্ধ না করিয়াই কাজ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছে। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, রিগা ও অন্যান্য

বড় বড় শহরে কনভেয়ারের উপরের জিনিসপত্রের তেজস্ক্রিয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

খাদ্য মিশ্রণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রশস্ততর করা, ধাতুশোধনে ভৌত রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং ধাতুর রাসানিক বিশ্লেষণের কাজ উন্নতর করিবার জন্য এই নূতন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হইতেছে। অতীতে যে সব বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না, এখন আণবিক শক্তির সাহায্যে সেইসব সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতেছে।

কলকারখানার ল্যাবরেটরীর শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বিজ্ঞানীরা উৎপাদনের নির্দিষ্ট টেক্‌নোলজিক্যাল সমস্যাবলী সমাধানের কাজে আজকাল ক্রমশ অধিক মাত্রায় পরমাণু শক্তি ব্যবহার করিতেছেন।

তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলিকে শান্তির সময়ে ব্যবহার সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত আছেন বহুসংখ্যক বিজ্ঞান সেবক ও ইঞ্জিনীয়ার। সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য সচেষ্ট সকলের নিকটই এই সব গবেষণাকার্যের দ্বার অবারিত। যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই বিশ্বাস পোষণ করা যায় যে, আণবিক পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে আমাদের ধাতুশোধন বিজ্ঞান ও তৎসংশ্লিষ্ট বিবিধ কাজে তেজস্ক্রিয় উপাদানসমূহের শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের কাজ আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হইবে।

মার্চ, ১৯৫৫

আণবিক পাইলের মডেল

বৃটেনের আণবিক শক্তি কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে লণ্ডনের বিজ্ঞান যাদুঘরে বর্তমানে আণবিক পাইলের একটি সুন্দর ও নিখুঁত মডেল প্রদর্শিত হইতেছে।

বার্কশায়ারের অন্তর্গত হারওয়েলে প্রথম যে দুইটি আণবিক পাইল স্থাপন করা হয়, উক্ত মডেলটি তাহারই বড়টির ক্ষুদ্র সংস্করণ। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ঐ পাইলটি চালু হয়। উহাকে ব্যবহার করা হয় গবেষণার জন্য এবং চিকিৎসা, কৃষি ও শ্রমশিল্পের কাজে ব্যাপকভাবে যে সকল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে 'রন্ধন' করিবার জন্য।

আসল পাইলটিতে যে যে কাজ হয়, মডেলটিতেও পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই সকল কাজ করিয়া দেখানো যায়। পাইলের উত্তাপ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রক ও নিবারক দণ্ডগুলি কী ভাবে কাজ করে এবং ইউরেনিয়াম রডগুলিকে কিভাবে পাইলের মধ্যে বোঝাই করা হয়, মডেলটি চালাইয়া দেখিলে তৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। পাইলটি চালাইবার জন্য ইউরেনিয়াম রডগুলিকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

১৯৪৫-৪৬ সালে ক্যানাডার মন্ট্রিল গবেষণাগারে বৃটিশ বৈজ্ঞানিকরা যে ডিজাইন প্রস্তুত করেন, তদনুযায়ী পরের বৎসরে হারওয়েল গবেষণাগারের জন্য প্রথম আণবিক পাইলটি নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে বৃটেন বিশ্বের অন্যতম প্রধান তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সরবরাহ কেন্দ্র। গত বৎসর হারওয়েলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে ৬৬৯৪টি অর্ডার আসে।

মে, ১৯৫৫

অপরাধী গ্রেপ্তারে আণবিক শক্তি

ব্রুসেল্‌স্—বেলজিয়ান পুলিশ আণবিক শক্তির সাহায্যে অপরাধী ধরিবার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। যেসব জায়গায় চোর-ডাকাতের আসিবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে তাহারা তেজস্ক্রিয় ক্লোরাইডের পুলিন্দা রাখিয়া দেয়।

চোর যদি একবার এই পুলিন্দা মাড়ায়, তবে তাহার জুতার তলায় প্রায় ৪ মাস কাল তেজস্ক্রিয় থাকে। পুলিশ তখন আণবিক বিকিরণ ধরার যন্ত্রের সাহায্যে সন্ধান করিয়া চোর-ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়।

অক্টোবর, ১৯৫৫

রাশিয়ায় আণবিক মোটরগাড়ি

গত ৬ই মার্চ মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ারগণ মোটর গাড়ির জন্য আণবিক ইঞ্জিন নির্মাণে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এ সকল ইঞ্জিনে জ্বালানী হিসাবে অতি সামান্য পরিমাণ ইউরেনিয়াম প্রয়োজন হইবে।

মস্কো বেতারে আরও বলা হয় যে, পোবেইদা মোটর গাড়িতে এক লক্ষ কিলোমিটার ভ্রমণের জন্য ১১ টন পেট্রোলের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে মাত্র কয়েক গ্রাম ইউরেনিয়াম ব্যবহার করিয়া অনুরূপ দূরত্বে ভ্রমণ করা সম্ভব হইবে।

মার্চ, ১৯৫৫

বৃটেনে আণবিক ঘড়ি

বিজ্ঞান সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকা "নেচারে" প্রকাশ, বৃটিশ বিজ্ঞানীরা আণবিক ঘড়ি নির্মাণে সক্ষম হইয়াছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রে যে সকল ঘড়ি এতদিন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে, নব উদ্ভাবিত আণবিক ঘড়ি তদপেক্ষা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হইবে।

অগাস্ট, ১৯৫৫

শস্যোৎপাদনে আণবিক শক্তি

রোমের খবরে প্রকাশ, ইটালীয় বিজ্ঞানীরা আণবিক শক্তির সাহায্যে ২ মাসের মধ্যে গমের ফসল ঘরে তুলিয়াছেন। সাধারণত উহাতে সাত মাস সময় প্রয়োজন হয়।

বিজ্ঞানীরা গমের বীজের উপর নিউট্রন ও গামারশ্মি প্রয়োগ করিয়া অসময়ে সেগুলি বপন করেন। ৬৪ দিনের মধ্যে ফসল পাকিয়া উঠে।

অগাস্ট, ১৯৫৫

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের নিগূঢ় রহস্য

যুক্তরাজ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার সম্পর্কে নতুন করে একটা উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই এই বিচিত্র পারমাণবিক উপজাত পদার্থটি সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করেছে। পদার্থটি ভেষজ এবং শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। বৃটেন এ সম্পর্কে বিদেশে এবং স্বদেশে ভাল বাজারও পেয়েছে। বার্কশায়ারের অন্তর্গত হারওয়েলস্থিত পারমাণবিক শক্তি গবেষণকেন্দ্রের প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আইসোটোপের কথা আজ সাধারণ্যে আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে—প্রথম বার্ষিক উৎসব কেন? যারা কোনো কিছু সম্পর্কে জুবিলী এবং শতবার্ষিক উৎসবের কথাই জানে তারা হয়ত এতে বিস্ময় বোধ করবে; কিন্তু তাদের জানা দরকার যে, এখনকার এই গতিশীল জীবনে পাঁচ বৎসর সময় কম নয়। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক স্যার জন কক্রফট্ সর্বসাধারণকে এই সময় বার্কশায়ার হিল্‌সের উপর রহস্যময় হ্যাঙ্গারগুলি সম্বন্ধে কিছু জানাবার সুযোগ দিয়ে ভালই করেছেন। এ সম্পর্কে সরকারী স্টেশনারী দপ্তর থেকে একখানি অতি

চমৎকার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, প্রচুর ছবি দিয়ে পুস্তিকাখানিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টাও হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের নিগূঢ় রহস্য আজ আমাদের কাছে অনেকটা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। আমরা এখন জানতে পেরেছি হারওয়েল এইসব আইসোটোপ কেন নরওয়ে থেকে নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে পাঠাতে আরম্ভ করেছে। এইসব আইসোটোপ আজ ব্যবহৃত হচ্ছে ভেষজ এবং শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে। মানবকল্যাণের কথা স্মরণ করে হারওয়েলের এই প্রতিষ্ঠানটি নিউক্লিয়াসের শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে যে বিপুল চেষ্টা করছে তার কথঞ্চিৎ পরিচয় এই সামান্য আইসোটোপের আবিষ্কার থেকেই জানা যায়।

পারমাণবিক ফাইল

এই গবেষণাকেন্দ্রের দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, গ্লীপ পারমাণবিক পাইল (Gleep-Graphite low energy experimental pile) এবং বেপো (Bepo-British experimental pile)। এই দুটি জিনিসই নিউ-ক্লিয়াসের শক্তিকে পরিবর্তিত করে বৈদ্যুতিক কিংবা যান্ত্রিক শক্তিতে। 'গ্লীপের' চেয়ে ৬০ গুণ শক্তিশালা 'বেপো' প্রথম পরিকল্পিত হয় ১৯৪৫-৪৬ সালে মণ্ট্রীল ল্যাবরেটরীতে বৃটিশ বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা। এর পরীক্ষামূলক কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে, গ্লীপের এক বৎসর পরে।

পুরাকালের রসায়নশাস্ত্রবিদেরা মৌলিক ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সে সময়ের সেই উত্তেজনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে হারওয়েলের গবেষকদের আবিষ্কারের উত্তেজনার সঙ্গে। এঁরা আজ সকলেই সন্ধান করছেন 'পরমাণু চূর্ণীকরণ' থেকে

ব্যবহারযোগ্যে শক্তির উৎস। আমরা সকলেই জানি যে, এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর বিদারণের ফলে এমন তেজ নির্গত হতে পারে যা ১·০০০ টন কয়লা প্রজ্বলনের সমান। কিন্তু প্রশ্ন এই—বাষ্প কিংবা বিদ্যুৎরূপে কী ভাবে এই শক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিকল্পনা হয়েছে—বেপো-কে ল্যাবরেটরী উত্তপ্ত করবার কাজে ব্যবহারের জন্যে!

অপরপক্ষে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ভেষজ এবং শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে আশ্চর্য ফল দেখাতে পেরেছে। পারমাণবিক পাইলগুলি আজ তার উৎপাদনকার্যে যথেষ্ট সাহায্য করছে।

চিকিৎসাকার্যে আইসোটোপ লক্ষণীয়ভাবে ফলপ্রদ হয়েছে। কিভাবে একজন রোগী তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের সলিউশন পান করে গলগ্রন্থির আকার এবং রোগাক্রান্ত কোষ সংস্থানের ছবি স্পষ্ট করে তুলছে তা দেহের মধ্য দিয়ে গলগ্রন্থি পর্যন্ত আইসোটোপের সঞ্চরণে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি টিউমারের মধ্যে সোনার আইসোটোপ সঞ্চারিত করে ভিতর থেকে টিউমার উচ্ছেদ করাও সম্ভব।

শ্রমশিল্পে এই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রতি সেন্টিমিটারে ১০,০০০,০০০ গ্রামের এক ভাগ পর্যন্ত পদার্থ ওজন করার কাজে সাহায্য করছে। কাগজ থেকে ইস্পাতের পাত পর্যন্ত জিনিসের স্থূলত্ব মাপা, এক্স-রে দিয়ে মাপার চেয়েও সহজ এবং সুলভ হয়েছে। বস্ত্রশিল্পেও তন্তুকে ধুলো থেকে রক্ষা করবার কাজে আইসোটোপ সাহায্য করছে। অবশ্য এইখানেই তালিকার শেষ নয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বরফপাতের পরিমাণ মাপছে এবং নারীর মুখের কস্‌মেটিকের ক্রিয়া নিরূপণ করছে।

এই বৎসর ৫,০০০ কাথস আইসোটোপ বিদেশে রপ্তানি হয়। সেই তুলনায় ১৯৪৮ সালে হয়েছিল মাত্র ২৩ বাক্‌স, এ থেকে বোঝা যায়, আইসোটোপের ব্যবহার কিভাবে ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করেছে।

এর ব্যবহার সম্পর্কে হারওয়েলে সম্প্রতি একটি আইসোটোপ স্কুল এবং একটি সংবাদ পরিবেশন ব্যুরো স্থাপিত হয়েছে।

অগাস্ট, ১৯৫২

পরমাণু শক্তির সাহায্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা

মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান লিউইস এল. স্ট্রাউস ঘোষণা করিয়াছেন যে, চিকিৎসা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি পারমাণবিক চুল্লী বা রিঅ্যাক্টর সহ একটি চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ব্রুকহ্যাভেন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরীতে নির্মিত হইবে।

নূতন গবেষণা কেন্দ্রটি ৬০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত হইবে। নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইতে দুই বৎসর সময় লাগিবে।

ব্রুকহ্যাভেন ল্যাবরেটরীতে বর্তমানে ২০টি অস্থায়ী চিকিৎসা ভবনে-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা হয়। নূতন কেন্দ্রটি পরমাণু চুল্লী ব্যতীতই ১,১৮,০০০ বর্গফুট স্থান দখল করিবে।

ব্রুকহ্যাভেনে ১৯৫১ সাল হইতে নিউট্রনের সাহায্যে চিকিৎসা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা চলিতেছে। সাধারণ রিঅ্যাক্টরের সাহায্যেই এতদিন এই গবেষণা কার্য চলিয়া আসিতেছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্মিত নূতন রিঅ্যাক্টরটির সাহায্যে মস্তিকের ক্যান্সার ও অন্যান্য কতকগুলি ব্যাধি সম্পর্কে গবেষণায় প্রচুর সুবিধা পাওয়া যাইবে।

নভেম্বর, ১৯৫৫

চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আণবিক শক্তি প্রয়োগ

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকাডেমি অব মেডিক্যাল সায়েন্সস্-এর করেস্পণ্ডিং মেম্বার ভি. জি. ফ্রাঙ্ক লিখিয়াছেন—আণবিক পদার্থবিজ্ঞান ও আণবিক শক্তি সদ্ব্যবহারের টেক্‌নিকের অসামান্য সাফল্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের নূতন নূতন সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

রোগ নির্ণয়ের কাজে তেজস্ক্রিয় পদার্থ যে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে লোহিত রক্ত কণিকার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলা যাইতে পারে। ইহা জানিতে পারা গেলে রক্তাল্পতা রোগের কারণও সঠিক জানিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যে সামান্য পরিমাণ চিহ্নিত লৌহ-অণু জীবদেহের অভ্যন্তরে প্রয়োগ করা হয়। লোহিত রক্তকণিকার গঠন, ক্রিয়ার প্রকৃতি ও উহার হার নির্ণয় করা যায়।

বাহির হইতে সঞ্চারিত রক্তের গঠনে চিহ্নিত পরমাণুর পর্যবেক্ষণেও উহা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্চারিত রক্ত যেন এইভাবে চিহ্নিত হইয়া যায়। যাহাতে সংরক্ষণ ও প্রাথমিক মজুতীকরণের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল সঞ্চারিত রক্তে লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল চিকিৎসকেরা নির্ণয় করিতে পারেন। এইসব সমস্যা সমাধানের পদ্ধতির সফল অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর করেস্‌পণ্ডিং মেম্বার এ. বাগ্‌দাসারোফের পরিচালনাধীনে ইন্‌সটিটিউট অব হিমাটোলজি অ্যাণ্ড ব্লাড ট্রান্‌সফিউশনে।

তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের সাহায্যে মানুষের গলগ্রন্থিতে আয়োডিন বিপাকের মেটাবলিজম সরাসরি পর্যবেক্ষণ সম্ভব। নূতন পদ্ধতির সাহায্যে দূর হইতে, কোনরূপ রাসায়নিক বিশ্লেষণ ছাড়াই, পর্যবেক্ষণের কাজ সহজ ও সুগম হইয়াছে। রশ্মি বিচ্ছুরণ ধরিবার কাউন্টার রোগীর গলায় স্থাপিত হয় এবং চিহ্নিত পরমাণু রশ্মি বিচ্ছুরণে গলগ্রন্থিতে গুপ্ত বিপাক-প্রক্রিয়া নির্ভুলভাবে জানাইয়া দেয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকা-

ডেমি অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর ইন্‌সটিটিউট অব থেরাপিতে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই সব তথ্য উচ্চ রক্তের চাপ নির্ণয়ের কাজেও প্রয়োগ করা যায়। কারণ দেহাভ্যন্তরের সাধারণ অবস্থা গলগ্রন্থির নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপে প্রতিবিম্বিত হয়।

সোভিয়েট দেশে তেজস্ক্রিয় সোডিয়ামের সাহায্যে রক্ত সঞ্চালন পর্যবেক্ষণের এক পদ্ধতি আয়ত্ত করা হইয়াছে। রক্তের মধ্যে প্রবিষ্ট চিহ্নিত শারীর-দ্রাবক জীবদেহের মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়িবার ব্যাপার সঙ্কেতে জানাইয়া দেয়। ইহাতে হৃৎপিণ্ড নালীর বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালনের হার দৃষ্টিগোচর হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র অ্যাকাডেমি অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর ইন্‌সটিটিউট অব বায়োলজিক্যাল অ্যাণ্ড মেডিক্যাল কেমিষ্ট্রিতে চিহ্নিত পরমাণুর সাহায্যে প্রোটিন, মাংস বা ছানা জাতীয় পদার্থের বিপাক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করা হইতেছে।

কেবল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই নহে, বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রযুক্ত হইতেছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ যদি বিভিন্ন পরিমাণে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহারা যে কেবল সঙ্কেতে তাহাদের অস্তিত্বের আভাসই দেয় তাহা নহে, জীবদেহের উপরও তাহারা প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু যে কোনো রাসায়নিক উপাদান তেজস্ক্রিয় করিতে পারা যায়, সেই হেতু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্গের উপর নির্বাচক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে।

গলগ্রন্থির টিউমারের চিকিৎসায় আয়োডিনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়; কারণ এই উপাদানটি গ্রন্থির মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং সমগ্র জীবদেহের উপর উহার প্রতিক্রিয়া অতি সামান্য। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস অস্থিগুলির মধ্যে সংস্থিত হয় বলিয়াই লিউকেমিয়ার বিরুদ্ধেও উহা প্রয়োগ করা যায় (রক্তের মধ্যে শ্বেতকণিকার আধিক্যজনিত—এই প্রকার ব্যাধিকে বলা হয় লিউকেমিয়া)।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই কল্যাণপ্রসূ পরমাণু শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছে তাহা খুবই সামান্য। বিস্তর গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ এখনও বাকী আছে। কিন্তু শত শত লোক ইতিমধ্যেই তেজস্ক্রিয় উপাদানসমূহের নিরাময়কারী প্রভাব অনুভব করিতেছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের গবেষণার ফল হইতে জানা যায়—মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও পরমায়ুর সেবায় নিযুক্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আণবিক শক্তি কি অপরিসীম সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

মার্চ, ১৯৫৫

চিকিৎসার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের নূতন ব্যবহার

সাম্প্রতিক এক সংবাদে জানা গেছে বৃটেন তার 'শান্তির জন্যে পরমাণু' পরিকল্পনাধীনে যে সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদন করেছে তা ব্যবহৃত হচ্ছে ৪১টি দেশে ; ভারত তার মধ্যে অন্যতম।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কী ভাবে ক্রমশ ভেষজ এবং শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্বন্ধে অধ্যাপক রোটব্লাট লিখেছেন : লণ্ডনের রয়াল ক্যানসার হাসপাতালের অধ্যাপক ডবলিউ. ডি. মেনিয়ার্ড এবং তাঁর একটি দল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার সম্পর্কে এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। বৃটেনের পরমাণু কেন্দ্রিন থেকে শক্তি উৎপাদন চুল্লীতে যে সব রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এমন এক আলোকরশ্মি বিকিরণ করছে যা রঞ্জেন রশ্মির সঙ্গে তুলনীয় ; অর্থাৎ যে রঞ্জেন রশ্মি সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থকে মেডিকেল রেডিওগ্রাফিতে দেহের বিভিন্ন অংশের এক্স-রে চিত্র গ্রহণের জন্যে।

রঞ্জেন রশ্মির এই উৎস অতি ক্ষুদ্র আয়তনের, প্রায় চাউলের দানার মতো। নিরাপত্তার জন্যে বাইরে থেকে আবরণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও সমস্ত জিনিসটা অতি সহজে ওয়েস্টকোটের পকেটে বহন করা সম্ভব। এই সহজ বহনযোগ্য এবং সুলভ এক্স-রের উৎস অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে যুগান্তর আনবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আশা করা যায়, এমন একদিন আসবে যেদিন গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চিকিৎসক এই ধরনের এক্স-রে উপকরণ নিজের কাছে ব্যবহারের জন্যে রাখতে পারবেন এবং বিজলী সরবরাহ বা অন্য কোনো জটিল ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। তিনি নিজেই সেটা তাঁর রোগীর কাছে বা দুর্ঘটনা স্থলে বহন করে নিয়ে যেতে পারবেন।

এর আর একটা বড় গুণ হলো এই যে, এর সাহায্যে শরীরের কতকগুলি গভীরতম অংশের এক্স-রে চিত্র গ্রহণ করা সম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে, চোয়াল এবং দাঁতের এক্স-রে চিত্র গ্রহণের প্রয়োজন হলে মুখের মধ্যে পদার্থটিকে প্রবেশ করিয়ে মুখের বাইরে থেকে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়। এভাবে একবারেই সব কয়টি দাঁতের চিত্র গ্রহণ সম্ভব। দেহের অন্যান্য অংশের চিত্রও এভাবে গ্রহণ করা চলে। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন এক্স-রে টিউবগুলির স্থান গ্রহণ করবে এ সব অধিকতর সুলভ এবং সহজ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ।

চিকিৎসা কার্যেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলি ক্রমশ এক্স-রে টিউবের স্থান গ্রহণ করছে। এ ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে বিকিরিত ধ্বংসাত্মক রশ্মিকে ব্যবহার করা হচ্ছে রোগগ্রস্ত কোষগুলিকে নষ্ট করবার জন্যে। বৃটেনে ইতিমধ্যে চিকিৎসা কার্যে এক্স-রে টিউবের পরিবর্তে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট এবং সিজিয়াম ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে।

রেডিয়েশন থেরাপি সম্পর্কে প্রধান সমস্যা হলো, সুস্থ টিসুগুলি সম্পূর্ণরূপে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই রোগগ্রস্ত টিসুগুলিকে নষ্ট করা

প্রয়োজন। এ কাজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডে ক্যান্সার হলেও রোগ-গ্রস্ত টিস্যুগুলিকে এ ভাবে নষ্ট করা যায়, এ সম্পর্কে রোগীর তেজস্ক্রিয় আয়োডিন মিশ্রিত এক পাত্র জল পান করাই যথেষ্ট।

অন্য ধরনের ক্যান্সার সম্পর্কে এ ভাবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ফুসফুসের ক্যান্সার সম্পর্কে সম্প্রতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজ হাসপাতালে ডাঃ ই. ই. পোচিনের অধীনে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কারের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলিকে একটি মাত্র ফুসফুসে কিংবা ফুসফুসের অংশবিশেষে জমা করা সম্ভব হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষা হয়েছে ; কিন্তু এ সম্পর্কে আরও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে।

দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে সলিসবারির প্লাস্টিক সার্জারী-কেন্দ্রে গ্র্যাফটিং তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের ব্যবহার আশ্চর্য সুফল প্রদান করেছে। পোড়া বা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চামড়া সম্পর্কে এই গ্র্যাফ্‌টিংয়ের প্রয়োজন হয়। খণ্ড খণ্ড ভাবে এই গ্র্যাফ্‌টিংয়ের কাজ চলে, কয়েক সপ্তাহ ধরে। কিন্তু যদি চামড়ায় এই গ্র্যাফ্‌টগুলিকে যথাযথ ভাবে সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব হতো তাহলে প্রয়োজনীয় সব গ্র্যাফ্‌ট সম্পর্কে একটা অপারেশনই যথেষ্ট হতো। এ সম্পর্কে একটা বড় অসুবিধা হলো যে, যে চামড়া কিছু দিন ধরে সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে তার জীবনীশক্তি বজায় আছে কিনা সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস ব্যবহারে এই কাজ সহজে করা যায়।

মৃত চামড়া ফস্‌ফরাস গ্রহণ করে না, কিন্তু জীবনীশক্তি সম্পন্ন চামড়া তা করে। এ ভাবে চামড়ার গ্র্যাফ্‌টগুলিকে সঞ্চয় করে রাখা আজকাল সম্ভব হয়েছে। প্লাস্টিক সার্জারিতে তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের ব্যবহার সম্পর্কে এ হলো একটি দৃষ্টান্ত।

হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সঞ্চালন সংক্রান্ত নানা ধরনের রোগ নির্ণয়

সম্পর্কেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন প্লাজমা বা রক্তরস সঞ্চারিত করা হচ্ছে রক্তের মধ্যে। রক্তের সঙ্গে তা চমৎকারভাবে মিশে যায়। লণ্ডনের কয়েকটি হাসপাতালে এ নিয়ে পরীক্ষার কাজ চলেছে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো; কিন্তু এ থেকেই বোঝা যাবে, কী ভাবে নিউক্লিয়াসের শক্তি জনকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই ব্যবহারের ক্ষেত্র কিরূপ ব্যাপক।

মার্চ, ১৯৫৫

ভারতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আমদানী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃটেনে শান্তির কাজে আণবিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র দিন দিন অধিকতর বিস্তৃত হইতেছে। বৃটেনের উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করিয়া বর্তমানে ভারত সহ বিশ্বের ৪টি বিভিন্ন দেশ কারখানা ও গবেষণাগারের কাজকর্মে বহু জটিল পদ্ধতির সরলীকরণ ও ব্যয় হ্রাস করিতে সক্ষম হইতেছে। বার্মিংহামে এক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে হারওয়েলের আণবিক শক্তি গবেগণাকেন্দ্রের-আইসোটোপ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ হেনরী সেলিগ্‌ম্যান উপরিউক্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

শ্রমশিল্প ও গবেষণার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বহুবিধ ব্যবহার প্রদর্শনের জন্যই বার্মিংহামে উপরিউক্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। ডাঃ সেলিগ্‌ম্যান বলেন যে, বিশ্বের বাজারে এই মূল্যবান পদার্থ রপ্তানীর ক্ষেত্রে বৃটেন অন্যান্য দেশের সহিত অতিশয় সাফল্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মোট রপ্তানী অপেক্ষা বৃটেনের রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য অনেক বেশি হইতেছে।

গত দুই বৎসরে বৃটেনে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি লণ্ডনে আণবিক শক্তি সংস্থার জনৈক মুখপাত্র প্রকাশ করেন যে, গত বৎসর উৎপাদনের মোট পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ২০,০০০ বাক্স এবং বার্মিংহাম প্রদর্শনীতে ডাঃ সেলিগ্‌ম্যান বলেন যে, বৃটেন গত বৎসর ৬,০০০ বাক্স আইসোটোপ বিদেশে রপ্তানী করে। ১৯৫৪ সালের বিশদ পরিসংখ্যান এখনও অবশ্য পাওয়া যায় নাই। তবে ইহা জানা গিয়াছে যে, ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃটেন ১৫,০০০ এরও অধিক বাক্স আইসোটোপ উৎপাদন করে এবং তাহার মধ্যে ৫,০০০ বাক্স বিদেশে রপ্তানী করে।

এই সময়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ আইসোটোপ আমদানী করে ফ্রান্স। ফ্রান্সের আমদানীর পরিমাণ ছিল ১,১০০ বাক্সেরও অধিক। কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে ভারত আমদানী করে ৪৪ বাক্স, অস্ট্রেলিয়া ৯৬ বাক্স, পাকিস্থান ১ বাক্স, সিংহল [শ্রীলঙ্কা] ২ বাক্স। কানাডা (যে নিজেও যথেষ্ট পরিমাণ আইসোটোপ উৎপাদন করে) ২৫ বাক্স, গোল্ড কোস্ট ৩ বাক্স, মরিশাস ৩ বাক্স, নিউজিল্যাণ্ড ১০০ বাক্স, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৫২ বাক্স, দক্ষিণ রোডেসিয়া ১ বাক্স এবং জাঞ্জিবার ১ বাক্স। এই সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রও বৃটেন হইতে ৩৫ বাক্স তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আমদানী করে। গত বৎসর বৃটেন নিজে যে পরিমাণ আইসোটোপ ব্যবহার করে তাহার প্রায় অর্ধেক ব্যবহৃত হয় হাসপাতাল ও চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে। শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে যেরূপ আইসোটোপের ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ রোগ-চিকিৎসার ক্ষেত্রেও, বিশেষত কয়েক ধরনের ক্যানসার রোগ চিকিৎসার কাজে ক্রমশ অধিক পরিমাণ আইসোটোপ ব্যবহৃত হইতেছে।

ডাঃ সেলিগ্‌ম্যান বলেন যে, শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও গবেষণার যে সকল নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত ও পরীক্ষিত হইতেছে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তাহার অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অনুবীক্ষণ

যন্ত্রের পর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলিয়া অভিহিত করা চলে।

বার্মিংহাম প্রদর্শনীতে শ্রমশিল্পের কাজে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বহুবিধ ব্যবহার বিশদভাবে প্রদর্শন করা হইতেছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারকারী যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে ঢালাই, ঝালাই ও পিটাইয়া প্রস্তুত করা ধাতু দ্রব্যাদির উৎকর্ষ পরীক্ষা করা হয়, যে সকল পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে তরল দ্রব্যাধারের ছিদ্র নির্ণয় ও পাতের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয়, যে পদ্ধতির সাহায্যে যন্ত্রাংশের ক্ষয় নিরূপণ করা হয়, ফিল্টারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়, নদী মোহনার কর্দমের গতিবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং দৃষ্টির অন্তরালে ভূগর্ভস্থ যন্ত্রপাতির কাজ তদারক করা হয়—বার্মিংহাম প্রদর্শনীতে সেগুলি বিশদভাবে প্রদর্শন করা হইতেছে।

১০,০০,০০০ ভোল্টের একটি বহুমূল্য এক্স-রে প্ল্যাণ্ট যে কাজ করে, একটি ক্ষুদ্র নল ও সীসার বাক্সে রক্ষিত একটি আইসোটোপের সাহায্যে সেই কাজ করা সম্ভব।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

সুদূর অতীত হইতে মানুষ যে সকল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছে, বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর অনেক স্থানেই সে সব রোগ নির্মূল করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শিশু-পক্ষাঘাত রোগের টীকা আবিষ্কার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক অবদান। মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ জোনাস ই. সল্‌ক্ এই ঔষধটি আবিষ্কার করেন। চিকিৎসক-বর্গের কাছে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ের ব্যবস্থা আজ আর তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ কতখানি অগ্রসর হইয়াছে ৫০ বৎসর পূর্বে মানুষের যে পরমায়ু ছিল তাহার সঙ্গে তাহাদের বর্তমান পরমায়ু তুলনা করিলেই তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০০ সালে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল ছিল ৫০ বৎসর। আর আজ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭০ বৎসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের জীবন রক্ষা এবং পরমায়ু বৃদ্ধি সম্পর্কে এই উন্নতি—সংক্রামক ব্যাধি, বিশেষ করিয়া শিশুরা যে সকল ব্যাধিতে কষ্ট পাইয়া থাকে সেই সকল ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্য ও জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতভাবে পরিবেশন এবং অবস্থানু-যায়ী তাহাদের প্রয়োগও ইহাতে সাহায্য করিয়াছে। সংক্রামক রোগ-বাহী জীবাণু নিয়ন্ত্রণের ন্যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নও মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধির ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে।

অর্ধশতাব্দী পূর্বে শিশুদের প্রধান সংক্রামক রোগ ছিল—হাম,

স্কার্লেট ফিভার বা হামজ্বর, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া ও বসন্ত। প্রধানত এই সকল রোগ নিরাময়ের ফলেই সমগ্র বিশ্বে মানুষের জীবন রক্ষা ও পরমায়ু বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। হাম রোগে গামা গ্লোবিউলিন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হয়। গামা গ্লোবিউলিন, রক্তরস বা প্লাজমারই একটি অংশ। ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর কেমব্রিজে অবস্থিত হার্ভার্ড প্লাজমা ফ্র্যাকশনেশন ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারযোগ্য গামা গ্লোবিউন প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং প্রস্তুত করা হয়।

হামজ্বর বা স্কার্লেট ফিভারে মানবদেহ অ্যান্টিবায়োটিক ভেষজের সঙ্গে সিরাম বা রক্তমণ্ড প্রয়োগ করিয়া সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মানো হয়। উল্লিখিত ঔষধ প্রয়োগের ফলে মৃত্যুর হার বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। স্ট্রেপ্টোকক্কাস নামে জীবাণুই স্কার্লেট ফিভার নামক রোগের কারণ। ১৯২৩ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ জর্জ. এফ. ডিক এবং তাঁহার পত্নী গ্ল্যাডিজ ডিক এই রোগ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া ইহার কারণ নির্ণয় এবং তাহার প্রতিরোধক সিরাম আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন।

অন্য আর একটি ভেষজ আবিষ্কারের ফলে হুপিং কাশির কষ্ট হইতেও পরিত্রাণের পথ বাহির হইয়াছে। মাকিন বিজ্ঞানী ডাঃ পল আর. বার্কহোল্ডার এই ঔষধটি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অ্যান্টি-বায়োটিক ঔষধটির নাম—ক্লোরোমাইসিটিন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, এই সকল ভেষজের মধ্যে কেনড্রিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত ভেষজই সর্বোত্তম। মার্কিন জীবাণুতত্ত্ববিদ মিচিগান রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাঃ পার্ল এল. কেনড্রিক এই পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

বিশ্বের বহুদেশেই আজ ডিপথেরিয়া ও বসন্ত রোগ টীকা দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে। হাঙ্গারীর পদার্থবিজ্ঞানী ডাঃ বেলাশিক আমেরিকায় আসিয়া ডিপথেরিয়া রোগের ঔষধ আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করিতেছেন। এই রোগের চিকিৎসা ব্যাপারে পথিকৃৎদের তিনিই অন্যতম। কোনো ব্যক্তির ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার

সম্ভাবনা আছে কিনা, তাহা নির্ধারণ করিবার একটি পদ্ধতি ডাঃ শিক আবিষ্কার করেন। ইহার নাম শিক-টেস্ট। তবে এই রোগের চিকিৎসা ব্যাপারে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ উইলিয়াম এচ. পার্কের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। রোগ প্রতিরোধক হিসাবে তাঁহার আবিষ্কৃত সিরাম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

বসন্ত রোগের চিকিৎসায় কার্যকরী পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন ডাঃ হিদোয়া নোগুচি। ইনি একজন জাপানী-বিজ্ঞানী। ডাঃ নোগুচি নিউইয়র্কে ভেষজ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান রকফেলার ইনস্টিটিউটের অন্যতম সদস্য। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য থাকিবার কালেই তাঁহার উল্লেখযোগ্য গবেষণাসমূহ সম্পন্ন হয়। তিনিই বসন্তের টীকার বিশুদ্ধ উপকরণ প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

বিগত ১৯০০ সালে আমেরিকায় নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগই ছিল জনসাধারণের মৃত্যুর প্রধান কারণ। ঐ সময়ে সমগ্র পৃথিবীতেও এই দুইটি রোগে বহুলোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই রোগে আক্রান্ত হইবার পর যে সকল উপসর্গ দেখা দিত, অ্যান্টিবায়োটিক ভেষজ প্রয়োগের ফলে তাহা এখন বন্ধ করা সম্ভব হইয়াছে। নিউমোনিয়া রোগে পেনিসিলিন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত এই রোগে অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক ভেষজ, যেমন—অরিওমাইসিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতিও প্রয়োগ করা হয়।

পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন বৃটিশ বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং। স্ট্রেপ্টোমাইসিন ১৯৪৪ আবিষ্কৃত হয় এবং বিজ্ঞানী ডাঃ সেলম্যান এ. ওয়াক্স্‌ম্যান ছিলেন এই আবিষ্কারের মূলে। ১৯৪৭ সালে লেডারলি ল্যাবরেটরীজ নামে আমেরিকার একটি ভেষজ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অরিওমাইসিন আবিষ্কৃত হয়।

১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যতীত আর একটি রোগের আক্রমণে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগটি হইতেছে যক্ষ্মা। ঐ সময়ে সমগ্র পৃথিবীতেও এই রোগে বহুলোকের

মৃত্যু ঘটে। এই সাংঘাতিক রোগীটিকে বর্তমানে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইতেছে।

বর্তমানে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন, শল্য চিকিৎসা এবং টীকার সাহায্যে এই রোগটিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে। এই রোগে স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে এবং এই ঔষধ প্রয়োগের ফলে মৃত্যুর হার অনেক হ্রাস পাইয়াছে। যক্ষ্মারোগে বি. সি. জি. নামক টীকা আজ ইউরোপ ও এশিয়ার কোনো কোনো স্থানে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে।

আমেরিকায় ন্যাশনাল টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ইহা ১৯০৪ সালে গঠিত হয়। জনসাধারণের অর্থ সাহায্যেই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব যে কী কী কারণে হইয়া থাকে, এই প্রতিষ্ঠান তাহা মার্কিন জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেয়। তাহাদের প্রচারিত তথ্য এই রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় বহুল পরিমাণে সাহায্য করে। বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর নানা স্থানে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান আরও গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে এই সকল প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।

মানুষের আর একটি গুরুতর ক্ষতিকারক রোগ হইল ম্যালেরিয়া। বিশ্বের বহুলোক এই রোগে ভুগিয়া থাকে এবং বহু দেশেই এই রোগটি দেখা যায়। রাসায়নিক দ্রব্য ডি ডি টি-ই এই রোগের বিস্তৃতি বন্ধ করিবার প্রধান ঔষধ। মশার দংশন হইতেই এই রোগ উৎপন্ন হয়। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীর নানা স্থানে এই রোগ নির্মূল করিবার জন্য অভিযান চালাইতেছেন এবং হাজার হাজার টন ডি ডি টি প্রয়োগ করিয়া মশক ধ্বংস করিতেছেন। আজ এই অভিযানের ফলে বিশ্বের বহুস্থান হইতেই ম্যালেরিয়া দূর করা সম্ভব হইয়াছে। আমেরিকার সায়নামাইড কোম্পানী রেটাক্লোরিডিন নামে ম্যালেরিয়ার একটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া প্রশমনের পক্ষে এই

ঔষধটি বিশেষ কার্যকরী।

ডি ডি টি কেবল ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে নয়, টাইফাস নামক এক প্রকার জ্বরের বিস্তৃতি প্রতিরোধক হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়। উকুনের কামড়ের ফলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলের আধিবাসী বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ভীষণ রোগে ভুগিতেছে। কোনো কোনো স্থানে এই রোগটাকে সাংঘাতিক রোগ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে টাইফাস রোগে ক্লোরোমাইসিটিন প্রয়োগ করিয়া অতি দ্রুত ফল পাওয়া গিয়াছে। তবে ১৯৫৪ সালে এই রোগ প্রতিষেধক এক টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত দুই বৎসর ধরিয়া বিশ্বের যে সকল অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, সেই সকল স্থানের লোকেরা টীকা গ্রহণের ফলে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেছে। আমেরিকার লুইজিয়ানার নিউ অরলিনের টুলেন বিশ্ববিদ্যালয় এই ঔষধটির দোষ-ত্রুটি সংশোধনের পর ইহাকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া প্রস্তুত করেন।

বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বের বহু স্থানে কলেরা, টাইফয়েড ও পীতজ্বর চিকিৎসায় বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এইসব রোগকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা সম্ভব হইয়াছে।

ডাঃ ওয়াল্টার রীড নামক মার্কিন বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলেই পীতজ্বরের রোগীকে আজ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা সম্ভব হইয়াছে। তিনিই ইহার ঔষধ আবিষ্কার করেন। ১৯২০ সালে হাভানার কিউবায় এই রোগের ঔষধ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল গবেষণা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। এক ধরনের মশকই যে এই রোগের বীজাণু বহন করিয়া থাকে তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা তাহা প্রমাণ করেন। ডাঃ রীডের এই আবিষ্কারের ফলেই আজ এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইয়াছে।

কলেরা রোগ প্রতিরোধের জন্য টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই টীকা

ব্যতীত আজ সালফা ড্রাগ্‌স্‌-এর কোনো কোনো ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই রোগ নিরাময় করা যে সম্ভব তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল সালফা ঔষুধও কয়েকটি দেশে, প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রেই আবিষ্কৃত হয়। এই সকল ঔষধের সকল ত্রুটি সংশোধন করেন আমেরিকার সায়নামাইড কোম্পানীর বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডাঃ এম. এল. ক্রসলী। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি এই সকল ঔষধের প্রধান উৎপাদক।

তবে কলেরায় আর একটি ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। নিউ জার্সির ডাঃ এডোয়ার্ড হেণ্ডারসন এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স অ্যাণ্ড সার্জেন্‌সের ডাঃ হেনরী সেনেকা এই ঔষধ আবিষ্কার করেন। ডেলেওয়ারের নিউইয়র্কস্থিত বায়োকেমিক্যাল ফাউণ্ডেশন কর্তৃক ১৯৪৪ সালে কলেরা টীকার সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। এই ঔষধটির নাম বি আর এফ। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, এই ঔষধ প্রয়োগে কলেরা রোগ নিশ্চিহ্ন করিবার ব্যবস্থা হইবে।

প্রধানত ময়লা জলই টাইফয়েড রোগ উৎপত্তির কারণ। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের দ্বারা এই রোগ অনেকখানি আয়ত্তাধীনে আনা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত টাইফয়েড চিকিৎসায় আজকাল অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ক্লোরোমাইসিটিন প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। এই ঔষধটিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাঃ বার্কহোল্ডার কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

তবে সিন্নেম্যাটিন নামে আর একটি নূতন অ্যান্টিবায়োটিক ভেষজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, টাইফয়েড জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীকে যে সম্পূর্ণ নিরাময় করা যাইবে তাহা অবধারিত। এই প্রথম এই রোগের যথার্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হইল। ১৯৫৪ সালে ইহার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। মিচিগান রাজ্যের জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার বহু বৎসরের গবেষণার পর এই ঔষধটি আবিষ্কার করেন।

আফ্রিকায় ঘুম রোগ নামে একপ্রকার রোগ আছে। একপ্রকার মাছির দংশন হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয়। মাছিই এই রোগের জীবাণু

বহন করিয়া থাকে। আফ্রিকার বিষুবরেখা অঞ্চলে প্রতি বৎসর বহুলোক এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিউইয়র্কের লেডারলী ল্যাবরেটরী ১৯৫৪ সালে পিউরোমাইসিন নামে একটি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঔষধটি আবিষ্কারের ফলে এই রোগ হইতে পরিত্রাণের পথ বাহির হইয়াছে।

ইদানীং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতি আশ্চর্যজনক উন্নতি হইলেও পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে ইহা সাময়িক ব্যাপার ; কারণ যে সকল অঞ্চলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে ও পরমায়ু বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই সকল অঞ্চলের অনেকেই আজ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। উল্লিখিত রোগসমূহ দূর করা হইলেও তাহারা হৃদ্‌রোগ ও ক্যানসার প্রভৃতি রোগের কবলে পড়িয়াছেন।

আজ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে এই সকল রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে পরীক্ষা পরিচালিত হইতেছে। এই সকল গবেষণা ও পরীক্ষার কাজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ফাউণ্ডেশন নামক প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের উদ্যোগ ও অর্থানুকুল্যে পরিচালিত হইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকারও এই সকল প্রচেষ্টায় অর্থ সাহায্য করিতেছেন। আমেরিকায় হৃদ্‌রোগ ও ক্যান্সার রোগ চিকিৎসা সম্পর্কে যে সকল প্রতিষ্ঠান গবেষণা চালাইতেছে তন্মধ্যে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটিই বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।

জুন, ১৯৫৫

নূতন ভেষজ সম্পর্কে গবেষণা

আধুনিক যুগে নূতন ভেষজ কম আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু তার জন্যে কী পরিমাণ গবেষণা, অর্থ এবং শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন হয়েছে, সে

সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা নেই। মানবজাতির কল্যাণে গবেষকদের এই সাধনা চিরকাল মানুষের মনে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক করবে। এ সম্বন্ধে ডাঃ টি. আই. উইলিয়ামস্ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলেছেন ঃ

বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইডের কথাই ধরা যাক। এই রাসায়নিক পদার্থটি বহুকাল ধরে সকলেরই জানা ; কিন্তু একশো বছরেরও বেশি সময় পরে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হলো যে, পদার্থটির এমন কতকগুলি মূল্যবান মৌলিক গুণ আছে যার ফলে পদার্থটি কীটঘ্ন হিসাবে কার্যকরী হতে পারে। এরপর এই পদার্থটি ম্যালেরিয়া এবং টাইফাস প্রভৃতি মারাত্মক রোগ বহনকারী কীটের বিরুদ্ধে ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হতে লাগলো।

সালফানিলামাইড—বহু মূল্যবান ভেষজের জনক। প্রথম সংশ্লেষিত হয় ১৯০৮ সালে, কিন্তু প্রায় ৩০ বছর পরে আবিষ্কার করা সম্ভব হলো জীবাণু সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় তার ব্যবহারের সম্ভাবনা। কিছুদিন আগে আর একটি সুপরিচিত রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধেও জানা গেছে যে, তার যে গুণ আছে তা অ্যাসপিরিনের গুণের প্রায় সমান।

এইভাবে আবিষ্কার কিন্তু একেবারেই সহজ নয়—এর পশ্চাতে আছে দীর্ঘদিনের গবেষণা। কোনো পদার্থের বিশেষ গুণ আবিষ্কারের মধ্যেই গবেষণার কাজ শেষ হয়ে যায় না। সেই পদার্থের ব্যাপক উৎপাদন সম্পর্কেও যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন হয়। এ সম্পর্কে যে যে কারিগরী সমস্যা অনেক সময় দেখা যায় তাতেও আবার বহু বছর অতিবাহিত হয়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ভিটামিন সি-এর আবিষ্কারের কথা। ভিটামিন-সি আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও কিন্তু তার ব্যাপক প্রস্তুত কার্যে বহু বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই প্রস্তুত কার্যে লক্ষ্য রাখতে হয়, কী ভাবে সুলভে সকলের হাতে গিয়ে তা পৌঁছাতে পারে। এখন বিশ্বের কে না জানে স্কার্ভি রোগের চিকিৎসায় ভিটামিন—সি-এর প্রয়োজনীয়তার কথা। অন্যান্য ভেষজ, যেমন—পেনিসিলিন,

ইন্‌সুলিন, প্যালুড্রিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন এবং সালফোনামাইড্‌স্‌ সম্পর্কেও একথা বলা চলে।

নূতন ভেষজ আবিষ্কার সম্পর্কে আকস্মিকতা একটা বড় কথা সন্দেহ নেই ; কিন্তু আকস্মিকতার সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হতে পারে এক-মাত্র গবেষণার মধ্য দিয়ে—এ কথা বৃটেনের ভেষজ শিল্প ভালো করে জানে বলেই তারা আজ প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে গবেষণার জন্যে। সাম্প্রতিক এক হিসাব থেকে জানা যায় যে, গবেষণা এবং উন্নয়ন সম্পর্কে বৃটেনে প্রতি বৎসর ব্যয়িত হচ্ছে ৩,০০০,০০০ পাউণ্ডেরও বেশি।

প্রধান প্রধান ফার্মগুলি সকলেই নিজেদের রসায়নাগারে যথাসম্ভব মৌলিক গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যত্র যে সব কাজ হচ্ছে তার ফলাফল সম্পর্কেও তারা পরীক্ষা চালাবার ব্যবস্থা রেখেছে। এই কাজে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন ; তাছাড়া প্রয়োজন আছে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার—রসায়নবিদ্‌ এবং চিকিৎসকদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব হলে এই কাজ সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, নূতন কোনো পদার্থের আবিষ্কার সম্ভব হলেও অনেক সময় সম্ভব হয় না তাকে চিকিৎসা কার্যে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা। কতকগুলি কারিগরী অসুবিধা তখন এমনই বড় হয়ে দেখা দেয় যে, তার ফলে এই সব অসুবিধা অতিক্রম করতে বহু মাস, বহু বছর অকারণে নষ্ট হয়ে যায়।

এতে হতাশা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু এই হতাশা গবেষকদের মনে নূতন করে প্রেরণা যোগায় গবেষণার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। গবেষণা পুনরায় শুরু হয় যথাসম্ভব অসুবিধা দূর করবার জন্যে এবং গবেষণাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। এই কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু এই অর্থ ফার্ম, বিশ্ববিদ্যালয় বা অ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কেউই ব্যয় করতে কুণ্ঠিত নয়। ফার্মগুলি অন্তত বিশেষভাবে জানে গবেষণার জন্যে প্রথম দিকে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হলেও এই অর্থ-ব্যয় বৃথা যাবে না, শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে তা লাভজনকই হবে। অবশ্য

এই জন্যে প্রথম দিকে ভেষজ বিশেষের মূল্য অধিক হয় এবং পরে এক সময় তা হ্রাস পায়, উৎপাদন সম্পর্কে গড়পড়তা মূল্য হ্রাস পাবার জন্য।

ফার্মগুলিকে গবেষণায় এই বিরাট ব্যবস্থা অটুট রাখবার জন্যে আবিষ্কৃত নূতন ভেষজ সম্পর্কে পেটেন্ট গ্রহণ করতে হয়। কোন ফার্মই চায় না, হাজার হাজার পাউণ্ড ব্যয় করে যে গবেষণা সে চালিয়ে এসেছে, সেই গবেষণার ফল অন্য কেউ বিনা বাধায় ব্যবহার করে। এই পেটেন্ট গ্রহণ ব্যবস্থা না থাকলে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হতো এমন সব ফার্মের সঙ্গে যাদের কোনো অর্থই ব্যয় করতে হয়নি গবেষণার জন্যে এবং তার ফলে প্রাথমিক অবস্থায় তার ভেষজের মূল্য বৃদ্ধি করে গবেষণার আংশিক ব্যয় তুলে নেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হতো। কোনো ফার্মের পক্ষেই এই ক্ষতি স্বাকার করে নেওয়া সম্ভব নয়।

যাঁরা ভেষজ সম্পর্কে পেটেন্ট তুলে নেওয়ার পক্ষপাতী তাঁদের মত এই যে, ভেষজ যখন মানুষের কল্যাণার্থেই আবিষ্কৃত হচ্ছে তখন তার পেটেন্ট গ্রহণ ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। এই মনোবৃত্তি ভেষজ সম্পর্কে যত শীঘ্র দূর হয়ে যায় ততই মঙ্গল। কথাটা ভালো, এর একটা স্বতন্ত্র আবেদনও আছে; কিন্তু এই নীতি কি বিপজ্জনক নয়? এই নীতি অনুসরণ কালে নূতন ভেষজের আবিষ্কার নিশ্চিতভাবে কমে আসবে। কারণ যে সমস্ত ফার্ম-গবেষণায় ব্যয় করছে তারাই এই নীতির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

একথা স্বীকার্য, যে সমস্ত নূতন আবিষ্কারের মূলে আছে ব্যাপক গবেষণা এবং এই গবেষণার জন্য অধুনা যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাও প্রচুর। একথা ঠিক যে, ভেষজ সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণার কাজ আইন করে শ্রমশিল্পের হাত থেকে রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে আসা সম্ভব; কিন্তু তাতেও ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে না যদি এই গবেষণার কাজ ব্যাপকভাবেই পরিচালিত করতে হয়। এই ব্যয় মেটাবার জন্যে হয়তো তখন প্রয়োজন হবে আরও কর আদায়ের ব্যবস্থা।

মে, ১৯৫৫

প্রাসঙ্গিক তথ্য

'আমরা ও পারমাণবিক শক্তি' Jhon Lewellen-এর 'You and Atomic Energy' [1949 ?] নামক একটি মার্কিন জনপ্রিয় পারমাণবিক বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ রূপে 'আমরা ও আণবিক শক্তি' বাংলা ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদক গোপালচন্দ্র বইটির নামকরণ করেননি—করেছিলেন প্রকাশক। গ্রন্থে গোপালচন্দ্র atom-কে সর্বত্রই পরমাণু লিখেছিলেন—কিন্তু প্রচ্ছদে ও নামপত্রে Atomic-এর অনুবাদ করা হয়েছে আণবিক।

বলা দরকার আমেরিকা পারমাণবিক গবেষণাকে সামরিক-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে দেখে, এবং যার ফলে পঞ্চাশের দশকের সূচনায় অ্যাটম বোমার তুলনায় আরো বিধ্বংসী হাইড্রোজেন বোমা নির্মিত হয়। এবং পারমাণবিক শক্তি যখন আর আমেরিকার একচেটিয়া রইলো না—সোভিয়েত রাশিয়াও অধিকারী হল সেই শক্তির ; সেই সময় ট্রুম্যান-আইসেনহাওয়ার জমানায় একদিকে যুদ্ধ নয় শান্তি চাই তথা শান্তি আন্দোলনের বিকাশের ফলে—ধুয়ো তোলা হয়েছিল পারমাণবিক শক্তি মানবকল্যাণে ব্যবহারের জন্য গবেষণার। কিন্তু গোপনে চলেছিল প্রতিরোধী পারমাণবিক অস্ত্র (Anti Ballistic Missile বা ABM), লেসার রশ্মি প্রয়োগ সহ নানা গবেষণা। পারমাণবিক বিজ্ঞান হল—সামরিক বিজ্ঞানের বড় অংশ। মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি সম্মেলনে যুদ্ধবাজ আইসেনহাওয়ার-এর ভাষণ ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

পারমাণবিক শক্তিকে সত্য সত্যই মানবকল্যাণে নিয়োগ করা সম্ভব—তা' সংকলিত বিজ্ঞান-সংবাদ থেকে প্রমাণিত।

তেজস্ক্রিয় প্রসঙ্গেও প্রচার শুরু হয়েছিল যে, তেজস্ক্রিয়তার বিপদ সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারের ফলে জনমানসে তৈরি হচ্ছে পারমাণবিক কুসংস্কার (Nuclear Superstition)। (দ্র. রিচি ক্যালডর-এর ১৯৬২-তে প্রকাশিত Living with the Atom)।

কিন্তু বেশ কয়েকটি ঘটনা প্রমাণ করেছে এই প্রচার অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক। তাই, নতুন করে প্রচার চললো—হ্যাঁ, তেজস্ক্রিয়তা বা তেজস্ক্রিয় আবর্জনা বিপজ্জনক—কিন্তু তা' তেমন কিছু নয়।

যা হোক মানুষের শরীরে কীভাবে এই তেজস্ক্রিয়তা ক্ষতি করছে দেখা যাক ঃ স্ট্রনসিয়াম 89.90→আবহমণ্ডল→মাটি ও উদ্ভিদ→গবাদি পশু ও মানুষ→দুধ ও মাংস→শেষ পর্যন্ত মানুষ।

এরকম সিজিয়াম 37, আয়োডিন 31, বেরিয়াম 40—শেষ পর্যন্ত পরোক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি করছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জয়যাত্রা / নূতন ভেষজ সম্পর্কে গবেষণা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অগ্রগতি ও ভেষজ বিষয়ক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়—চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন আর ভেষজ সর্বস্ব নয়। শল্যচিকিৎসায় পাঁচের দশকের অগ্রগতি তুলনায় এখনকার চিত্র আলাদা। এখন—চিকিৎসা শাস্ত্র হাই-টেক্‌নির্ভর—অবশ্যই বিত্তবানদের কাছে।

আর আবিষ্কৃত যে-সব ওষুধ ধন্বন্তরী বলে একদা পরিচিত ছিল—পরে প্রমাণিত হয়েছে—তার অনেকগুলিই ক্ষতিকারক।

গোপালচন্দ্র পেটেণ্ট প্রথা প্রসঙ্গে ওষুধ প্রস্তুতকারক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর গবেষণা ও গবেষণা ব্যয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। এখন কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থার একচেটিয়া কারবার ভেষজ উৎপাদনে। আর তাদের ভূমিকা, ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, প্রচারের ফলে ওষুধ নির্ভরতা এবং তার ফলে ওষুধ থেকে নতুন অসুখের খবর এখন আমাদের জানা থাকলেও পাঁচের দশকে জানা ছিল না। যদিও হ্যানিমান (১৭৫৫-১৮৪৩) সাহেব সতর্ক করেছিলেন—কিন্তু তা' হোমিওপ্যাথির অ্যালোপ্যাথির বিরুদ্ধে প্রচার বলে অনেকে বিশ্বাস করেনি।

কিন্তু এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করছে Introgenic disease-এর কথা—যার সৃষ্টি হয় ওষুধ থেকে। অ্যাণ্টিবায়োটিকস্‌ সম্পর্কে ১৯৭২ সালে বার্মিংহামে বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন থেকে বোঝা যাচ্ছে অ্যাণ্টিবায়োটিকের আশু নিরাময় ক্ষমতা থাকলেও তাঁরা ভবিষ্যতে এর কুফল সম্পর্কে গভীর দুশ্চিন্তায় আছেন। (দ্র॰ Current Antibiotic Therapy ঃ ড. গেডেস ও ড. উইলিয়ামস্‌-কর্তৃক সম্পাদিত। 'লণ্ডন ১৯৭৬)। এই সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল 'Antibiotics After Thirty years'। ডি-ডি-টি'র কুফল তো আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে—এরকম আরো অনেক কীটঘ্ন রাসায়নিক আজ বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত। [তথ্যসূত্র ঃ সঙ্কটের আবর্তে সমাজ ও সভ্যতা : ১ ঃ রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গ ওষুধ ঃ ড. সুখময় ভট্টাচার্য।]
